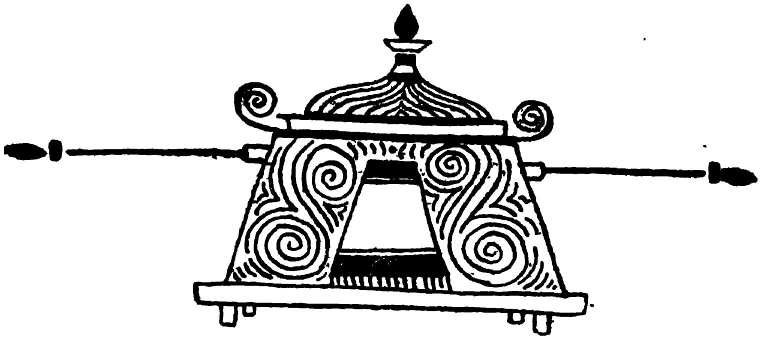


জরাসন্ধ সম্পাদিত

শুভ সংবাদ

রূপায়ণী প্রকাশনী
১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৬৮ সাল

প্রকাশক
মৈনাক দত্ত
২৪ সি, রামকমল সেন লেন,
কলকাতা-৭

মুদ্রক
শ্রীযুগল কিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২/এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলকাতা-৬

সহ সম্পাদনা
সুজিতকুমার নাগ

প্রচ্ছদ
সত্য চক্রবর্তী

সূচীপত্র

রাসুর বিবাহ	···	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	····	৯
গায়ে হলুদ	···	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	···	২৩
তিলোত্তমা	···	বনফুল	····	৩৫
রূপ দর্শন	···	অন্নদাশঙ্কর রায়	···	৪৪
বসন্তে	···	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	···	৬১
একা	···	জরাসন্ধ	···	৮০
ঘুম কাতুরে	···	আশাপূর্ণা দেবী	···	৮৮

এই গ্রন্থের সবকিছু দায়দায়িত্ব সুজিতকুমার নাগের।



রাণুর বিবাহ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রাণু। রাণুর বিবাহ। বাপ ষাট টাকা বেতনে স্কুলে মাস্টারী করেন। মেজকাকা উকীল, ছোটকাকা ডেপুটী। উপার্জ্জনের দিক হইতে আয়ের সমষ্টি অল্প নয়, কিন্তু সংসারটি বৃহৎ। সংসার তিন ভাইয়ের। সন্তান-সন্ততির সংখ্যা উনিশ এ ছাড়া এক ভাগিনেয়ীর এক ছেলে, এক ভাগিনেয়ের পুত্রও এই সংসারে থাকিয়া পড়াশুনা করে। ইহার পূর্ব্বে চার ভাগিনেয় এখানে থাকিয়া পড়াশুনা শেষ করিয়াছে, অন্যত্র কাজকর্ম্ম করিতেছে। একজন উকীল, দুইজন ডাক্তার। চার-পাঁচ ভাগিনেয়ীর বিবাহও এই বাড়ি হইতে হইয়াছে। মোটকথা, ধনসমাগমের পথ সুগম হইলেও নির্গমনের পথ ততোধিক সরল ও সুগম বলিয়া হাঁটু বলে উপরের দিকে তো কখনও উঠিলই না, বরং দিন-দিন নীচের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে।

রাণু মেয়েটি সুন্দরী নয় তবে সুশ্রী। ভাগ্যও ভালই বলিতে হইবে যে, পাত্রপক্ষ নিতান্ত অল্পেই প্রসন্ন মনে কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইয়া গেল। পাত্রটিও ভাল, সরকারী চাকুরে, সদ্য পুলিস সাব-ইন্স-পেক্টরীতে ভর্তি হইয়াছে। বয়স তেইশ-চব্বিশ। দেখিতেও শ্রীমান।

রাণুর বাপ ভোলানাথবাবু কথাবার্তা পাকা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভোলানাথবাবু সরাসরি অন্দরে গিয়া মা'র পায়ের ধুলা

লইয়া বলিলেন—আপনার আশীর্ব্বাদে সব ঠিক হয়ে গেল, মা।

মা তরকারী কুটিতেছিলেন। তরকারী কোটা ফেলিয়া দিয়া দুইটি হাত অর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া যেন দারুণ দুশ্চিন্তাটাকে চিরতরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাক্ বাবা বাঁচলাম। বৌমা—বৌমা—অ বড় বৌমা—শুনছ, রাণুর বিয়ে আজ পাকা হয়ে গেল।

রাণুর মা ও খুড়ি অদূরে ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মা আবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—দেখ্ ভো রে, সুকুমারী কোথায় গেল? ডাক্ তাকে। ভবানী, সুরো—এদের ডাক্।

সুকুমারী ভোলানাথবাবুর মাসীমা, ভবানী বিধবা ভগ্নী; সুরমা বিধবা ভগ্নী—ভোলানাথবাবুর অপর এক ভগ্নীর কন্যা।

ভবানী পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—এই যে আমি। সুরোও এই ঘরে রয়েছে। আমি শুনেছি, সুরো হয় তো শুনতে পায়নি। সুরো, অ সুরো।

অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, যেন মাটির প্রতিমার মত মেয়ে সুরমা; সে আপন অভ্যাসমত আসিয়া দাঁড়াইল, চোখে-মুখে কোনও ঔৎসুক্য নাই, দৃষ্টিতে কোনও প্রশ্ন নাই—নিতান্ত ভাবলেশহীন মুখ। সে আসিয়া শুধু যেন কোনও আদেশ প্রতিপালনের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

ভোলানাথবাবুর মা ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—সুরো, শুনেছিস্, রাণুর বিয়ের কথা আজ পাকা হয়ে গেল।

সুরমা কানে ভাল শুনিতে পায় না। সে অতি মৃদু একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিয়াছে, অথবা—বেশ, বেশ।

—কে রে—সর্, কে রে? সর্—সর্—এ্যাড়া কাপড়ে ছুঁস্‌নে। আঃ, তুই আবার হাঁ ক'রে দাঁড়ালি কেন?

ইতিমধ্যে কখন ছেলেরা আসিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদের পিছন হইতে ভোলানাথবাবুর মাসীমা হাঁকিতেছিলেন—সর্—সর্!

যে ছেলেটা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার হাত ধরিয়া

সরাইয়া লইয়া ভোলানাথবাবু বলিলেন—সরে এসো না বিভূতি। শুনতে পাচ্ছ না, তোমায় সরে যেতে বলছেন।

পথ মুক্ত পাইয়া মাসীমা হাতের ঘটীটা হইতে গোবরজল-ছড়া দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন - বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, দিদি?

উত্তর দিলেন ভোলানাথবাবু—হ্যাঁ মাসীমা, সব ঠিক হয়ে গেল দিনও ঠিক হয়ে গেল। আসছে মাসের ৪ঠা আর ১২ই—মানে পাত্র যেদিন ছুটি পায়!

—লগ্নপত্র করেছো তো বাবা?

ভোলানাথবাবু বলিলেন —সে আবার কি, মাসীমা?

—ঐ তো বাবা, তোমরা সব সায়েব হয়ে সব ভুলে গেলে। লগ্নপত্র হবে, তার মাথায় সিঁদুর দেওয়া হবে, দুই পক্ষ তাতেই সই করবে।

রমানাথবাবু বলিলেন—Marriage contract বোধহয়।

মাসীমা বলিলেন—ওই তো বাবা, বিয়ে সুদ্ধ তোমরা ইংরিজী করে ফেল্লে! আর তোমাদেরই বা কি দোষ দেব বল—মেয়েদের হাল দেখে যে অবাক হই গো। বিয়ের পাকা কথার খবর এল, আর বাড়ির এয়োরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। দেখ না, সব মেমসাহেব হয়ে পড়েছে, শাঁক বাজাতে ভুলে গেছে, উলু দিতে লজ্জা করে…

এতক্ষণে মা বলিয়া উঠিলেন—ও মা, তাই তো, শাঁক বাজাও, বৌমা, উলু দাও সব। কি হ'লে গো তোমরা—ছি-ছি-ছি!

বাড়ির এয়োরা এতক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিল; একজন তাড়াতাড়ি শাঁক আনিতে ছুটিল।

ভোলানাথবাবুর বড় মেয়ে চিনু খুঁজিতেছিল রাণুকে। এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়া সে বোধকরি সমবেত সকলকেই প্রশ্ন করিল—রাণু কই গো, রাণু কই? রাণু—রাণু!

মাসীমা বলিলেন—এই, রাণু-রাণু ক'রে পাগল হয়ে উঠলেন একেবারে! যত সব মেমসাহেবী ঢং, দেখলে গা জ্বালা করে আমার। আরে, আগে শুভকাজ মঙ্গল-আচারগুলো সেরে ফেল।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে বাড়িখানা মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাসীমা এতক্ষণে পরিতুষ্ট হইয়া গোবরজল-ছড়া দিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে যাইতে যাইতে বলিলেন—এই তো। সংসার-ধর্ম্মকে দিয়ে সকলের উঁচু আসন—আচার-ভ্রষ্ট হ'লে হিঁদুর সংসার টেঁকে ?

বাহিরের ঘরে ছেলেদের মধ্যে বড়দের তখন জটলা বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। ভোলানাথবাবুর মেজছেলে গোপাল খবরটা লইয়া আসিল।

বড় ভাই গোবিন্দ বেকার। সে তখন ছোট একটা আয়না দেখিয়া কেশ-প্রসাধনের নূতন একটা ভঙ্গী আবিষ্কারের গবেষণায় নিমগ্ন ছিল। রমানাথবাবুর বড় ছেলে সুধাংশু নিতান্ত অকারণে গভর্ণরের কাছে একটা দরখাস্তের খসড়া লিখিতেছিল। ভোলানাথবাবুর ভাগ্নের ছেলে শ্যামল গোপনে রচনা করিতেছিল একটা কবিতা। ভগ্নী ভবানীর দৌহিত্র রমেন অঙ্কের খাতায় একটা পাঁচতলা বাড়ির নক্সা লইয়া চিন্তায় বিভোর।

গোপাল যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিয়া ফেলিল—রাণুর বিয়ে পাকা হয়ে গেল, দাদা।

গোবিন্দ আয়নাখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল—Finally settled তো ?

সুধাংশু দরখাস্তখানা ফেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—কবে ?

শ্যামল প্রশ্ন করিল—সেই শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গেই তো ?

রমেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন খুঁজিয়া না পাইয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষায় নীরব হইয়া রহিল।

গোপাল উত্তর দিল—একেবারে final হ'য়ে গেল আজ। দি

ঠিক হয়েছে দুটো—একটা ৪ঠা আর একটা ১২ই—যেদিন শ্রীকুমার-বাবুর ছুটি পাওয়ার সুবিধে হবে সেদিন আর কি। পুলিসের চাকরী তো—এঁ্যা?

বাড়ির ভিতরে তখন মায়ের চারিধারে ঘন হইয়া বসিয়া পরামর্শ-সভা চলিতেছে। মা বলিতেছিলেন, সময় থাকতে চিঠি দেওয়াই ভাল—তাদেরও সব ঘরসংসার গুছিয়ে আসতে হবে তো। ননী নিশ্চয় আসবে, মণিকে নিয়েই ভাবনা, তার আবার নানা ঝন্‌ঝাট। শিবানী তো আসবেই, সমরও আসবে। হ্যাঁ, সমরের বৌ আছে বাড়িতে, সেখানেও একটা চিঠি দাও।

মা এবার নীরব হইলেন।

কথা হইতেছিল মায়ের মেয়েদের আসিবার। ভোলানাথবাবুর সাত বোন। ভবানী অবসর পাইয়া বলিল—শ্যামাও আসবে। ভুল, আমি তাকে আগেই লিখেছি। জামাইও পাঠিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। এখন তোমরা জামাইকে একটা চিঠি দাও।

শ্যামা ভবানীর কন্যা।

ভোলানাথবাবু ওদিকের উঠানের কোণে একটি ছেলের কান্নায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আঃ, রঙ্গীনটা কাঁদছে কেন? ওরে বাপ্, দেখনা বেরিয়ে। আমি বারবার বাপুকে বলি—ওরে, ছেলেদের দিকে একটু নজর রাখিস্ তুই। এঁ্যা, একি…দেখি দেখি। টিঞ্চার আইডিন। টিঞ্চার আইডিন!

চিবুকটা কাটিয়া রক্তে সমস্ত বুকটা রক্তাক্ত করিয়া রঙ্গীন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেজভাই রমানাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—বেঞ্জইন দিয়ে সীল করে দিন। বেঞ্জইন—টিন্‌চার বেঞ্জইনের শিশিটা কোথায় গেল? বলিয়া তিনি হাঁকিতে আরম্ভ করিলেন—গোবিন্দ—গোপাল—শুধাংশু…

গোবিন্দ তখন বলিতেছিল—দেখ, পাঁচজন বাইরের ভদ্রলোক আসবেন। তাদের সামনে—অথচ বাবা হয় তো বলবেন, ওই জামাতেই হবে। ওইটে কি একটা জামা। পাঁচ বছরের পুরানো হয়ে গেল।

অন্তত একটা ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবী—ডীপ চকলেট কি গ্রে রঙের, আর একজোড়া জুতো।

শুধাংশু বলিল—আমি তো একটা সার্জ্জের কোট নেব—নেভি-ব্লু কলার, বেশ ডিসেণ্ট।

গোপালের বেশী সখ একটা পুল-ওভারের। সে বলিল—আমার একটা পুলওভার হ'লেই হবে। কমে হবে, এ সময় খরচ বেশী করা তো ঠিক নয়, এঁ্যা?

শ্যামল বলিল—একটা প্রীতি-উপহার কিন্তু খুব ভাল চাই।

রমেশ ভাবিতেছিল, চুলটা আজ আর না কাটিয়া সেই সময়েই কাটিবে, সেই ভাল হইবে।

রাণু তখন সদ্যঃস্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। মুখে তাহার অতি মৃদু-মধুর একটু হাস্যরেখা। পুরাতন সোজা সিঁথিটা মুছিয়া দিয়া তাহার সখ হইল বাঁকা সিঁথি টানিবার। চিরুণীটা দিয়া পিছনের দিকে চুলের রাশি সমানভাবে ঠেলিয়া পুরাতন সিঁথিটা মুছিয়া বাঁ দিকে সবে সিঁথিটা টানিয়াছে, এমন সময় রক্তাক্ত রঙ্গীনকে কোলে করিয়া ভোলানাথ ঘরে ঢুকিয়া রাণুকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে! ও, চুল আঁচড়ান হচ্ছে। কিন্তু এ রকম বিলাসিতা তো ভাল নয়, চুল আঁচড়াতে যদি তোমার দু'ঘণ্টা যায়—

ওপাশ হইতে রমানাথবাবু বলিয়া উঠিলেন—Up-to-date হচ্ছেন! Most ludicrous!

ভোলানাথবাবুর মাও উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—আমাদের তখন বিয়ের কথা হ'লে, সে যেন একটা দারুণ লজ্জার কথা হ'ত। আমরা কারো সামনে বেরুতাম না।

গোবর-জল ছড়া দিতে মাসীমা কোথায় যাইতেছিলেন। ঘরের মধ্যে জটলা দেখিয়া তিনি উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—রাম-রাম-রাম, ওকি সিঁথি হয়েছে? মাগো! ধিঙ্গি মেয়ে ফিরিঙ্গি হতে সাধ হয়েছে বুঝি বিয়ের কথা শুনে। মুছে ফেল, মুছে ফেল বলছি, ও

বিচ্ছিরি সিঁথি।

রাণু পাংশু মুখে রোরুদ্যমান রঞ্জীনকে কোলে লইয়া সেখান হইতে পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

দিন কয়েক পর।

অগ্রহায়ণের ৬ই তারিখ। ৪টা তারিখে পাত্রের ছুটি পাওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া ১২ই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।

ভোলানাথবাবু কয়খানা চিঠি হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিলেন—মা, শিবানীদিদি তো কাল আসছেন। ননীদিদি লিখেছেন, সম্ভব হলে বিয়ের আগের দিন এসে পৌছবেন। মণিদিদি আসতে পারবেন না। হ্যাঁ, শিবানীদিদির সঙ্গে ওর ছোট মেয়ে প্রতিমা আসছে। আর তিনি লিখেছেন, অণিমাকে আনবার জন্যে যেন আজই কাউকে শক্তিগড়ে পাঠানো হয়। অণিমা অনেক দিন আসেনি। জামাই পাঠাতে রাজী হয়েছেন।

অণিমা শিবানীর মেজ মেয়ে।

মা বলিলেন—তাহলে গোবিন্দকে পাঠিয়ে দাও আজই। আর সমর, বিমল আসছে কবে?

সমর শিবানীর পুত্র—ডাক্তার। বিমলও অন্য এক দৌহিত্র—সেও ডাক্তার।

—সমর বিয়ের আগের দিন আসবে, আবার বিয়ের পরদিনই চলে যাবে। ডাক্তার মানুষ। বিমল আরও একদিন আগেই আসবে। তবে, সে লিখেছে, সে এসে আপন শ্বশুরবাড়িতেই উঠতে চায়, কারণ এখানে তো লোকজনের ভিড় হবে—তার নানারকমের অসুবিধে। আমি তো বলি মা, এ খুব ভাল প্রস্তাব। কি বলেন?

মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—বেশ, তাই লিখে দাও।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামা কোন পত্র দেয়নি, ভুলু?

তাড়াতাড়ি একখানা পত্র বাহির করিয়া ভবানীর হাতে দিয়া বলিল—এই যে। শ্যামা আসবে তিনদিনের জন্য—এই যে চিঠি দিয়েছে।

গোবর-জল ছড়া দিতে দিতে সুকুমারী কোথায় যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া বলিলেন—ও বাবা ভুলু, বিয়ের বাজার করতে যখন যাবে আমার জন্যে এক প্রস্থ কোশাকুশী কিনে এনো, মাণিক। তোমার মেয়ের বিয়ে—মাসীকে ওটা তোমায় বিদেয় দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি ভোলানাথ বলিলেন—বেশ তো মাসীমা, বেশ তো।

—হ্যাঁ বাবা, বেশ একটু ভারী দেখে, আর গড়নটা যেন ভাল হয় —ঠিক যেন কলার মোচার ধরনের।

মা বলিলেন—হ্যাঁ ভুলু, গোপাল, সুধাংশু বড্ড ধরেছে আমাকে, একটা প্রীতি-উপহার...

—না-না মা, অনর্থক বাজে খরচ করে কি হবে বলুন? ও আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। আমি ওদের না বলে দিয়েছি।

—আমিও বলেছিলাম হবে না, কিন্তু ওরা সব আমার নামে কবিতাটা লিখে এনেছে। বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তারপর আবার বলিলেন—বেশ লিখেছে রে, শুনবি তুই? কি—দাঁড়া—'কত গরু-খোঁজা ক'রে পেয়েছি তোমারে ছেড়ে তো দিব না আর হে'। এমন ঠাট্টা করে লিখেছে। তা, দু-তিন টাকা খরচ তো! যখন এত হবে তখন ওদের সাধটাও মিটুক।

সুকুমারী বলিলেন—আমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই বাবা, তবে মনে থাকে যেন, বেশ একটু ভারী দেখে আর এই কলার মোচার মত ঢংয়ের। তিনি চলিয়া গেলেন।

ভবানী বলিল—ভুলু, রমেনের একটাও জামা নেই যে ভদ্দর লোকের সামনে বেরোয়। ওর একটা জামা—

ভোলানাথবাবু বলিলেন—বাইরে দর্জি এসে মাপ নিচ্ছে দিদি, রমেনের মাপ নিয়ে নিয়েছে।

বাহিরে তখন রমানাথবাবু বসিয়া ছেলেদের জামার মাপ দেওয়াইতে ছিলেন। গোবিন্দের পাঞ্জাবী, শুধাংশুর নেভি ব্লু রংয়ের সার্জের কোট, রমেনেরও গরম কাপড়ের কোটের মাপ দেওয়া হইয়া গেল। গোপালের পুলওভার এ বেলাতেই আসিবে। সে টাকার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

রাণুর বড় বোন চিনু মাকে গিয়া বলিল—মা, রাণুর বড় ইচ্ছে যে, ওকে একটা ফার-কোট কিনে দেওয়া হয় যেন। ওর ভারি সাধ।

রাণুর মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঁকে বলতে যে ভয় করছে মা। কিছু বললেই একেবারে যেন মারতে আসছেন।

চিনু বলিল—ওর ওটা বড় সাধ, মা

রাণুর মা চুপ করিয়া রহিলেন।

এদিক হইতে ভোলানাথবাবু চীৎকার করিতেছিলেন—না-না, তোমাকে যেতে হবে না, দাও-দাও আমাকে দাও, আমি যাব।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল গোপালকে লইয়া। সে পুলওভারের মূল্যের অপেক্ষায় ছিল। এমন সময় ভোলানাথবাবু আদেশ করিলেন —চিঠি ক'খানা ডাকে দিয়ে এসো তো!

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া গোপাল দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলানাথবাবু বলিলেন—যাও

—পুলওভারের টাকাটা পেলে বাজার হয়ে···

সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথবাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন—দাও-দাও, চিঠি ফিরিয়ে দাও আমাকে, আমি নিজে যাব।

গোপাল দৃঢ়মুষ্টিতে চিঠি কয়খানা ধরিয়া রহিল।

ভোলানাথবাবু চিঠি কয়খানা সজোরে তার হাত হইতে কাড়িয়া

লইয়া বলিলেন—না-না, তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাব।

চিঠি কয়খানা লইয়া তিনি ঘরে আসিয়া ডাকিলেন—বড় বৌ, বড় বৌ।

রাণুর মা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া বক্তব্যের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন। ভোলানাথবাবু বলিলেন—তোমার কাছে যে চল্লিশ টাকা আছে, সেটা দাও তো।

রাণুর মা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি করবে?

—আঃ! যাই করি না, গঙ্গার জলে দিয়ে আসব না দাও।

—না, সে টাকায় আমি রাণুর একটা আংটি আর ঝুমকো গড়িয়ে দেব। আর হ্যাঁ, রাণুর বড় সাধ একটা ফারকোট—

—ফারকোট! বিস্ময়ে ভোলানাথবাবুর চোখ দুইটি বড় হইয়া উঠিল।

রাণুর মা আশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কথার ফুৎকারের অভাবে ভোলানাথবাবু আর জ্বলিয়া উঠিতে পারিলেন না, ধূমায়মান অবস্থাতেই বলিলেন—ফারকোট পরে ক'রো। আর ঝুমকো আংটিও থাক্। ও তো চুক্তির মধ্যে নয়। এখন টাকাটা আমাকে দাও।

—রাণুর বড় সাধ! অসহায়ভাবে রাণুর মা অসমাপ্ত কথাগুলি বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—সাধ তার অনেক কিছু হতে পারে। জড়োয়া গহনা, মুক্তোর মালা, হীরের মুকুট, পান্নার দুল, কিন্তু সে আমার দেবার সাধ্য নেই।

ওদিকে বাহিরে রাণুকে লইয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেছে। স্নানের ঘরের দরজায় সুকুমারী ঠাকুরাণী মিনিট দশেক অপেক্ষা করিয়া ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিলেন—কে ঘরে রয়েছে, কে? এতক্ষণেও স্নান হয় না? কে রয়েছিস?

রাণু সাধ করিয়া একখানা লাক্স সাবান মাখিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি কোনরকমে স্নান সমাপ্ত করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই সুকুমারী বলিলেন—ওমা, যাব কোথায় আমি! এত

সাবান মাখার ধুম। ছি-ছি-ছি! এই ঠাণ্ডা, আর এতক্ষণ ধ'রে সাবান মেখে স্নান!

ভবানী রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, এযে মুখ-চোখ এর মধ্যেই রাঙা হয়ে উঠেছে!

সত্যই অত্যধিক সাবান-ঘষার ফলে রাণুর মুখের ফর্সা রং রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। রমানাথবাবু ঘরে ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—দেখ, তুমি অত্যন্ত....থাক্। এখনই ওকে কুইনিন খাইয়ে দিন একটা। আর একটা কাজ করুন, ছেলেদের একজোড়া মোজা এনে দিন তো। মোজা পায়ে দিয়ে কারও একজোড়া স্যাণ্ডেল নিয়ে চলাফেরা করুক। তাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয়টা একটু কমবে। বলিয়া নিজেই ঘর খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিলেন একটা কালো ও একটা লাল রঙের মোজা।

রাণু মোজা জোড়াটা হাতে করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার এই বিসদৃশ পোষাক পরিতে চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল; রমানাথবাবু পুনরায় আদেশ করিলেন—প'রে ফেল্।

এবার রাণু কহিল—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না।

—ঠাণ্ডা লাগবে না! রমানাথবাবু ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ কারণটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—I see, তোমার লেডিজ সিল্ক্ মোজা না হ'লে পছন্দ হচ্ছে না। তারপর ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দিদি, ওর বাবাকে বলুন, মেয়েকে লেডিজ সিল্ক, সকস কিনে দিতে, নইলে ওর পছন্দ হচ্ছে না!

রাণু সভয়ে ত্রস্তভাবে মোজা দুটি টানিয়া লইয়া সেইখানেই বসিয়া পায়ে পরিয়া ফেলিল। পরিয়াও কিন্তু রাণুর চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে নত মাথা আরও খানিকটা নত করিল, চোখের জল মাটিতে পড়িয়া মুহূর্তে শুষিয়া গেল।

ভোলানাথবাবুর মা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন—রমানাথ, টেকো দিয়ে সূতো কেটে দিতে হবে যে বাবা!

সুকুমারী স্নানের ঘর হইতেই হাঁকিয়া বসিলেন—অ দিদি, কলসীতে আলপনা দেবে কখন, আজই ত দেবার কথা।

মা উত্তর দিলেন—এই বসল বোধ হয় সব। ওমা, উলু দিতে বল শাঁখ বাজাতে বল! কথাটা শেষ হইতে না হইতেই শাঁখের শব্দের সঙ্গে উলুধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাণু ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া ছাদের এক কোণে নিরালায় বসিয়া ভালো করিয়া কাঁদিয়া লইল। সমস্ত সংসারের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের দিন। ভোলানাথবাবুর ও রমানাথবাবুর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। আত্মীয়-স্বজনে ঘর পরিপূর্ণ হইয়াছে। সমর আসিয়াছে, বিমল আসিয়াছে। প্রতিমা, অণিমা, শ্যামা, তাহারাও সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শিবানী এবং আর এক বোন আসিয়াছে।

ইলেকৃট্রিক মিস্ত্রী তার খাটাইতেছিল। ভোলানাথবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিলেন—সমর কোথায় গেল, সমর?

কে বলিল—তিনি মোটরের কি পার্টস্ চাই, তা কেনবার জন্য গেছেন।

—বিমল, তাহলে তুমি একবার স্টেশনে যাও না, বাবা।

বিমল মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—আর কেউ গেলে হয় না? আমি একটু গারটার ক্লিপটা এঁটে আনতে যাচ্ছি।

—অ, তাহলে দেখি। গোবিন্দ কোথায়?

গোবিন্দ তখন অণিমা, প্রতিমা ও সমরের ছেলেমেয়েদের জামার মাপ দেওয়াইতেছিল। অণিমার ছেলের প্রতিমার ছেলেদের মত স্যুট হইবে। প্রতিমার মেয়েদের অণিমার মেয়েদের মত জামা হইবে। সমরের মেয়েরও একটা জামা হইবে।

গোবিন্দ বলিতেছিল—দেখুন, ফ্রক-স্যুটই হবে, তবে গলাটা হবে অণিমাদির মেয়ের মত—মানে, এই জামাটার মত রাউণ্ডশেপ, আর এর হাতটা আছে হাফ—এই হাতটা হবে প্রতিমাদির মেয়ের জামার মত ফুল-হাতা। তবে কাঁধের কাছটা একটু ফুলো থাকবে।

ভোলানাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—তুমি করছ কি?

—প্রতিমাদি, অণিমাদি···

—আঃ! গোপাল কোথায়?

—সে গেছে দোকানে' শ্যামাদির জন্যে মেজবৌদির কাপড় দেখিয়ে একখানা কাপড় আনতে।

ঘরের মধ্যে রাণু বধূবেশে তখনও মাকে বলিতেছিল—আমায় একটা ফারকোট কিনে দিলে না, মা?

রাণুর মা বিরক্ত হইয়া বলিল—দিয়ে-থুয়ে কখনও তো মেয়ের মন পাওয়া যায় না সংসারে।

—কই, কই রে? ও বাড়ির দিদি ঘরে ঢুকিলেন একরাশ জিনিস লইয়া। রাণুর মা একটি ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—ওরে, ডাক্ তো সব—ঠাকুমাকে, খুড়ীমাকে, সকলকে। বল্, দাদি কত জিনিস দিয়েছেন, দেখবেন আসুন।

দেখিতে দেখিতে ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

বিবাহ হইয়া গেল।

বাসরে কলরব উঠিতেছিল। রাণু ছিল নীরবে বসিয়া। দাদি ঐ মোটা শরীর লইয়া শুধু গান নয়, নাচও আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। বাঃ, প্রতিমাদিদির মুক্তার কলারটা কি সুন্দর মানাইয়াছে—বেনারসীখানাও কি সুন্দর! অণিমাদিদি হাতে বোধ হয় বারোগাছা

করিয়া চুড়ি পরিয়াছেন—আলোর ছটায় ভাল করিয়া চাওয়া যায় না। রাণু আপন হাতের কয়গাছি মিনমিনে চুড়ি নাড়িতে নাড়িতে কি যেন ভাবে! তাহার মনের আনন্দ উদাস হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বর-কন্যা বিদায়ের সময় রাণু কিন্তু অবাক হইয়া গেল। কনকাঞ্জলি দিতে-দিতে রাণুর মুখের পানে চাহিয়া ভোলানাথ-বাবু ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া রাণুর চোখেও জল আসিল। সে অবাক হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, শুধু বাবা নয়, ঠাকুমা কাঁদিতেছেন, ওই যে মা'ও কাঁদিতেছেন! ওই যে সুকুমারী-ঠাকুমার চোখেও জল। তাহার জন্য—শুধু তাহারই জন্য সকলে কাঁদিয়া সারা! এমন মুহূর্ত জীবনে কোনদিন আসে নাই—তৃপ্তির গৌরবে তাহার বুক ভরিয়া গেল। ফারকোটের দুঃখ, আভরণের অভাবের বেদনা সমস্ত ঘুচিয়া গিয়াছে। সেই মুহূর্তে সত্যসত্যই সে রাজরাণীর মত মহিমময়ী, বন্দনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। সকলকে ছাড়িয়া সে আজ পর হইতে চলিয়াছে। যে বেদনা তাহার মনের মধ্যে একটা বিন্দুর মত টলটল করিতেছিল, সেই বেদনা অকস্মাৎ যেন সমুদ্রের মত বিশাল হইয়া উঠিল। চোখের জলে তাহার চন্দন-চর্চিত মুখ ভাসিয়া গেল।



গায়ে হলুদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের দিন। বর্ষার বিরাম নেই। এই বৃষ্টি আসছে, এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে আউস ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেছে, ধানের শিষ দেখা দিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কিযে সেটা ঠিক ক'রে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জেঠিমা বলেছে—ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাস্‌নি। আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয়-ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার? মঙ্গলবার। শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়। এই গ্রামেই, এমনকি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেছেন এখানে, দু'খানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেছেন—একখানা রান্না ঘর। এতদিন ধরে সে সঙ্গিনীদের

সঙ্গে সেই বাড়িতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েচে—যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ি তৈরী করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে—তখন সে কতবার ভেবেচে, এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ি করে বাস করবার কার না জানি মাথা ব্যথা পড়ল।

কে জানত সেই বাড়িটাই—আজ একবছর এখনও পোরে নি—তার শ্বশুরবাড়ি হবে।

কতদূর আশ্চর্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হল। যখনই সে এ কথাটা ভাবে, তখনই তার মন যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়!

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়িতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছে। বেশ ফর্সা লম্বা মত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয়নি। আগে আগে সত্যি কথা বলতে গেলে সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেছে তাদের বাড়িতে, পুঁটি ভাবতো-—দেখো না, ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত তো মনে হয়ই না, মনে হয়, বেশ চমৎকার মুখ! গ্রামের মধ্যে অমন চোখ, অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে—হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস্, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু-পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়িতে চারটে বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা

গোলার চেয়ে অনেক ছোটো, তিন-চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্তি, সব ক'টা আউড়ি ভর্তি। কলকাতায় চাকরী করেন এ পাড়ার হরিকাকা। তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে আপনি তো রাজা। গোলা ভর্তি ধান রেখেছেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্ছে, আর আপনি···

পুঁটি জিজ্ঞেস করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

—কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে? তুই নিজের কাজ কর, অমি নিজের করি, মিটে গেল।

—তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে, না বাবা?

—না জেনেও তো পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও বেশ চলে যাচ্ছে

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্যে চার ঘণ্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কিন্তু যে বাড়িতে তার বিয়ে হচ্চে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাস করে তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আফিসে চাকরী ক'রে দেবেন। তা হলে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে, আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে যে বড় কষ্ট। তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধহয় সব সকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাবরাপোতা থেকে সীতানাথ কলু আড়ৎদার এসেছে—ধান কিনবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জেঠিমা বললেন—ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ি থেকে হলুদ দিয়ে আসবে, সে-হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায়

নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে ভিজতে-ভিজতে এসে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় ক'রে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা, তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন, পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার—এই শনিবার তাহলে সত্যিই তার—

সাধন বললে—আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জন্মে কোনও কালে শুনিনি, রায় মশায়। এক সের দের সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না! মরা গাঙে বাঁধাল দিয়েলাম একদিন—কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা তো কখনও শুনিনি।

—অরিবৎ গজাড়, রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রী হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ির মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেছে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হতো। তার জীবনে যে এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার হতে চলেচে, এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর ক্ষেন্তি জেলেনীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয়নি। অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়াও জানে ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরী করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে-বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের

বাড়ি যায় যখনই, তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভালো লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না। লতিদি একটু ট্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না? তাকে বলে -তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস্ তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে —এ কি বই বল না লতিদি?

—যা-যা, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেছিস? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা—এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে-টড়ে বসে আছ, এতসব নাম জানো, কই, তোমার তো আজও বিয়ে হল না। আমার জীবনে এতবড় একটা আশ্চর্য কাণ্ড তো টুক করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলেই তো আজ—কই, তোমাদের তো—তারপর ম্যাট্রিক পাস বর। এ গাঁয়ে পাস করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবনদা। সে নাকি দুটো পাস—কোথায় চাকরী করচে যেন—ঐ দিকে কোথায়! যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাসের খবর বেরুবার দেরি নেই। বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাস করবে। হে ভগবান! তাই করো, পাস যেন সে করে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা-ঠাকরুণ, ও-বাড়ি থেকে দেখে এলাম গায়ে হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসছে ও-বাড়ি থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে? পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ী। আর একখানা ডুরে শাড়ী আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচভরি সোনা দেবার কথাবার্তা

হয়েচে। এতদিন দু'টি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি। অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের! গোলায় দু'টো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়? যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে-সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বকনা বাছুরটা ভিজচে। কচুপাতায় জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলছে—ও দিদি ঠাকরোণ, তা একটু তামাক গ্যাও মোরে, বিয়ে বাড়ি যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে তো বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা।

একটু বেলা হয়েচে। বাড়িতে অনেক লোক এসেছে বিয়ের জন্যে। বিয়ে বাড়ির মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন। আজ বেলা এগারটার সময় আরও একদল আসবে, ইষ্টিসানে গাড়ি গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোর-পুরের কাকীমা যাবার সময় তাকে বলে গেল, বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস্ পুঁটি, সে-দু'খানা পিঁড়ি হয়েছে কিনা।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের

বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয়নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এসো মা।

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে ও শুনলে, ওর বাবা এবং আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা—

—তাহলে পাল্‌কির বন্দোবস্ত দেখতে হয়।

—আজ্ঞে, পাল্‌কি কোথায় মিলবে? ষোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসো বনগাঁ থেকে।

—এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

—ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দ্যাও একটা।

—আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়িতে বর আন্‌লি কেমন হয়?

—সে কি! আরে না-না, সে দেখতে বড় খারাপ হবে! শুনছি, ওরা ইংরিজি বাজনা আনছে। বলদের গাড়ির পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

—কেন বাবু, তাতে কি? বলদের গাড়িতে কি আর বর যায় না? একেবারে আপনাদের বাড়ির পেছনে এসে থামবে—সেই তো ভালো।

—বলদের গাড়িতে বর যাবে না কেন? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায়? তাছাড়া পেছনের ও-পথ আইবুড়োদের পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুলতলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিছি। সেখান থেকেই পালকি আনাতে—

—সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু!

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়িতে? হি-হি। সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে…

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

—ও তিনু…তিনু রে, শোন্ একটা মজার কথা—

তিনু চারবছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্চে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি?

—জানিস, এই আমাদের বাড়ি বর আসবে।

—বল?

—হ্যাঁরে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ি চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে…হি-হি—

তিনু না বুঝে হাসলে—হি-হি।

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ির ছেলেমেয়েদের ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁটাল খেয়ে যা। ও হিমু, পান্তা ভাত কে-কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্তা রয়েচে, সেগুলো কাঁটাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ভাত ফেলতে পারবো না এই যুদ্ধের বাজারে।

পান্তা ভাত ও কাঁটাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার যো নেই। খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁটালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারত, কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও-বাড়িতে শাঁক ও উলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ি—তাহলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মত দূরও নয়।

ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বললে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্চে।

পুঁটি ধমক দিয়ে বললে—চুপ। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

—বা রে, হয়েছেই তো। আর তো দু'দিন দেরি।

—না, তা হোক্। আগে থেকে বলতে নেই।

—জ্যাঠাইমা তো বলচে।

—কি বলচে?

—বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে-হলুদ হচ্চে, সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে।

—তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

—আচ্ছা দিদি, দাদাবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাস করেচে?

—খবর এখনও বের হয়নি।

—আমি ও পাড়ায় রাধীদের বাড়ি গিইছিলাম এই এট্টু আগে। রাধীর দাদা পাস করেছে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েছে।

—তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়িতে শাঁক বেজে উঠলো, উলু পড়লো। নাপিত তত্ত্ব নিয়ে আসছে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ি থেকে দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো। জ্যাঠাইমা বলেছিলেন, আশীর্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হ'তেও পারে, কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তাহলে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল,

মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না, লেখাপড়া জানে না, আরও কত কি? কিন্তু সুবোধ···না, ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকী অনেকগুলো কি ব্যাপার যেন স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁখের ডাক, উলুধ্বনি—মা, কাকীমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ী, তেল-হলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এলো তাদের বাড়ি। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা-জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বললেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হল, প্রদীপ দেখানো হল—যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না। মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল, কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ দিতে হল গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে-হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর গাঁয়ের মেয়েরা কেউ-কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকে সে যায়নি। একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান আর গন্ধ তেল। এসব জিনিস তার নিজস্ব। কারও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছট্‌ফট্ করছিল, ওপাড়ার লতিদি, হিমি, অম্ব, রাধী—এরা কেউ আসেনি। এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—

যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে-হলুদের মত আশ্চর্য ব্যাপারটা আজ সত্যই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ির দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করবে, বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ-হৈ হবে—ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। ছাখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুজ্যে বাড়ি। মুখুজ্যে গিন্নী ওকে দেখে বললেন—কি রে পুঁটি, আয় মা, আয়। গায়ে-হলুদ হয়ে গেল ? আহা, এখন ভালোয়-ভালোয় ছু-হাত এক হয়ে গেলে—বোস মা, বোস।

একটু পরে লতিকাও সেখানে এসে হাজির হ'ল। পুঁটিকে দেখে বললে—ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে-হলুদ ছিল না ? হয়ে গেল ? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ি থেকে ?

মুখুজ্যে গিন্নী বললেন—বোস্ মা তোরা! লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর একটু, চা করে আনি। যাক, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি কষ্ট, যে দেয় সেই জানে।

পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে গাঙ্গুলিদের ছোটবৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি ? গায়ে-হলুদ হয়ে গেল ? তা কই, আমাদের একবার বলতেও তো হয়! এই বাড়ির পেছনে বাড়ি—

পুঁটি বললে—গেলেন না কেন বৌদি ? আমরা তো বারণ করিনি যেতে! শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ, এ উত্তরটা দেওয়া ওর উচিত হল না। এখানে ও-কথা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী ব্যাপারের জন্যে সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলিদের ছোটবৌ মুখ লাল ক'রে উত্তর দিলে—কি বললি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমরা কখনও গায়ে-হলুদ দেখিনি, শাঁকে ফুঁ পড়তে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাবো তোমাদের বাড়ি পাতা পাততে ? অত আংখার ভাল নয় রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েছে, না ? অমন বিয়ে আমরা কখনও কী দেখেছি

জীবনে ? ছেলের না আছে চাল, না আছে চুলো—সংসারের মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলের বিদ্যে কত, জানতে বাকী নেই, এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে।

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বললে—কে বললে ছোট বৌদি ? সুবোধবাবুর পাসের খবর তো পাওয়া যায়নি।

—কেন পাওয়া যাবে না ? চিঠি এসেছে, ফেল করেছে বলে ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেছে। বিয়ের আগে ও-খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোস্টকার্ডের চিঠি। উনি সন্ধ্যের পর সুবোধদের বাড়ি দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া।

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েছে। মুখরা দর্পিতা ছোটবৌ-এর মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে ? চেঁচামেচি শুনে মুখুজ্যে গিন্নী হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন। লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুজ্যে গিন্নী ঘরের মধ্যে এসে চাপা ভাষায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ! ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন ক'রে বিষ ছড়াতে আছে! ছিঃ ছিঃ, দ্যাখ্ তো মা লতি কাণ্ডটা।

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলছে—চল, চল, পুঁটি তোকে বাড়ি দিয়ে আসি। ছিঃ, বৌদির কী কাণ্ড ? ওসব কথা মনে করিসনে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি, ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও বলার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হ'ল লতিদিও এ খবরটা জানে। কী জানি, হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সেই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে। বললে—লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোট বৌদিকে ? খারাপ কথা কিছু ?



তিলোত্তমা

বনফুল

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটা নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোতা সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ-পর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এ সব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সেও বি. এ. পাস করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, সখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারেণ্ডা বাজাইয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনি আসিতে লাগিল।

বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি পিতার, তেজারতি-ব্যবসা, মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতে কোন কালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন সখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ

লোক। কুষ্ঠি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন, তাহার ডাকনাম তিলু, ভাল নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট-ছোট চোখে ভীরু শংকিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি, নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই, কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটি হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে, অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচশত টাকা পণ কম দিয়াছে। বলিয়াছে, এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকী টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলীর রং উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। আংটিটা সোনার কিনা কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মত। তিনি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? যখন তিনি যাহা-যাহা দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা তাহাতেই রাজী হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশিই করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিত হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেন বা কেন তিনি! সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে৷ তো। কিন্তু এ কি কাণ্ড!

ওই অতি বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল? বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার-বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে, নকুলের 'ভীমরতী' ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে। ছি ছি ছি ছি! নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন, 'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রং, একপিট চুল, দিব্যি চোখ-মুখ, গোল-গোল গড়ন। চোর, জোচ্চোর, ব্যাটা ধড়িবাজ। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।'

সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমনকি গোকুল পর্যন্ত।

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বইকি। একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভালমানুষ। মুক্তোকেশী বেগুনের মত তাহার মুখখানিতে যেন ভালমানুষি মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়াই থাকে, ইহাতে আশ্চর্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত, কিন্তু সে করিল না। সসংকোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি? সে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকারী হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ-কোলাহল তুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হইতে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো, হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।

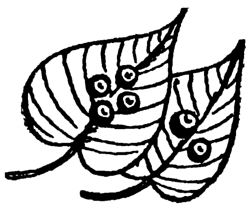
তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, হলেও তোমার যদি তাতে সুখ হয়, সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। সে কিছু বলিল না।

বছরখানেক কাটিয়া গেল।



তিলুর সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানে লেখাপড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে কাঁড়ি-কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশিরাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেন না, সে বাহিরের কাজকর্ম লইয়া থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি-না, বকুল-বনে পাপিয়া ডাকিল কি-না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরাণীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনো বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও আন্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতা যাইতেছিল। ষ্টেশনে টিকিট কাটিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে-ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমনকি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রূপার কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিতমুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে-একে সবই ছাড়তে হল এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারিনি, বাবা।

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপও শুরু হইয়া গেল। দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ী-নক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও

মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমনকি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করবে বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?

না, এখনও হয়নি।

আর একখিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, দেখ বাবা, তাহলে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মত একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পাল্‌টি-ঘর। তোমাকে ভারী পছন্দ হয়েছে আমার। আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়। যদি বল, তা হলে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

উষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয়, তা হলে—

আমতা-আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার স্ত্রী বর্তমান, সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে উষা! তেমন মেয়ে সে নয়। তাকে লেখাপড়া, গান-বাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মত অবাধ্য তাকে হতে দিইনি। আর-একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তাছাড়া, তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

তা হলে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

উষা নয়, দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে-হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড়সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই। হাসির পরদায়-পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল। গোকুল কূল হারাইল।

ইহার মাসখানেকের মধ্যে সব প্রায় ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্তা চালু করিয়া দিলেন।

উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়, আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাট একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে, যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু তিনি যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি।

উষা একটি শর্ত করিল। সে শর্তে গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলেই রাজি হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে। কাল

সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না! এত কাণ্ড হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। গোকুল এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়াই শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জনে দেখা হয় নাই। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বইকি। গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তম সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কি?

আজ আশীর্বাদ। মনে আছে তো?

আছে।

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে-শুনেছ সে কথা?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যদি দয়া করে যা তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কা পড়ে আছে।

তিলোত্তমা চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠি বসিল। বিছানা হইতে নামিয়া সে জানালার নিকট গি

দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

আশীর্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পড়িয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে, এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন, শাঁখটা বাজায় কে? আমার ঠোঁটের মাঝখানে ব্রণ হয়েছে একটা। ও বউমা, কোথায় গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও।

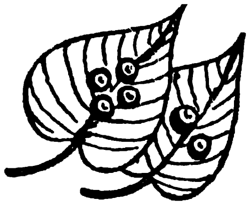
শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।





রূপ দর্শন

অন্নদাশঙ্কর রায়

সেদিন নয়ন মোহনের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। এসেছিলেন এক বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রী হয়ে। আমি ছিলুম কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত। দেখা হতেই দু'হাত ধরে বললেন, মনে পড়ে?

আমি তাঁর দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললুম, না, মনে পড়বে কেন? মনে পড়ার তো কারণ নেই। মনে পড়ার তো কথা নয়।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। ইচ্ছে ছিল তোমার ওখানে উঠব। কিন্তু জানোই তো, বরযাত্রীরা স্বাধীন নয়। এসেছি একটা দলের সঙ্গে দলচর হয়ে। সেইজন্যে···

সেইজন্যে একখানা চিঠি লিখেও জানাতে নেই যে আসবার কথা আছে ময়মনসিংহে। না নয়নদা, তোমাকে আমার মনে পড়ে না। মনে পড়বে, যদি তুমি এখন আমার ওখানে ওঠ।

না ভাই, এ যাত্রা নয়। এর পরে আবার যদি কোনদিন আসা হয় তো নিশ্চয় উঠব। এবার আমাকে মাফ করতে হবে। বুঝলে?

তাঁর কণ্ঠস্বরের কারুণ্য আমাকে স্পর্শ করেছিল। আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করলুম না। শুধু একবার চা খেতে ডাকলুম। তিনি রাজি হলেন। পরের দিন চা খেতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে একবার কী বলেছিলে মনে আছে?

বিশবছর পরে দেখা। কী করে আমার মনে থাকবে, কবে কী বলেছিলুম। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না মনে নেই।

বলেছিলে, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, শুধু দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ।

তাই নাকি! কই, আমার তো মনে নেই।

তোমার মনে থাকার কারণ নেই, আমার মনে থাকার কারণ আছে। তাই সেদিন ভাবছিলুম, তোমার কথাই অবশেষে সত্য হলো কবি।

তিনি আমাকে কবি বলে ডাকতেন।

কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হতো। তিনি সেই নিঃশ্বাসেই বললেন, এ যা হলো তা আরো মর্মান্তিক।

আমি জানতুম নয়নদার বিয়ের গল্প। জানতুম না তার পরিণতি। নয়নদার বিয়েতে আমি বরযাত্রী হয়েছিলুম, কবিতা লিখে ছাপিয়েছিলুম। বোধ হয়, বৌদির রূপ দর্শন করে সান্ত্বনাচ্ছলে বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দেননি, যাকে দেননি সেও রূপবতী কবির চোখে।

আমি তো রিয়ালিস্ট নই। হলে সাফ কথা শুনিয়ে দিতুম নিষ্ঠুরভাবে। কিন্তু যাঁর বিয়ে, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। রূঢ় বাস্তব তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। বিয়ের পরে তিনি আমাদের কারো কাছে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন, ভাই, এ যে পোড়া কাঠ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, দাঁত বার করা, নাক চাপা, এ যে করালী।

নয়ন মোহনের নিজের মত ছিল না। তিনি শাসিয়ে রেখেছিলেন আত্মঘাতী হবেন। কিন্তু তাঁর দাদারা তাঁর মাকে বুঝিয়েছিলেন যে, ডিক্রীদারের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে ডিক্রীদারের দুহিতাকে বধূ করতেই হবে। মা বললেন, সম্পত্তি যদি যায় তো কে তোকে সুন্দর মেয়ে দেবে? কী দেখে দেবে? তখন তো সেই কালো মেয়েই বিয়ে করতে হবে। দেখিস, আমার কথা ফলে কি না ফলে।

এর উত্তরে নয়নদা বলেছিলেন, তা কেন হবে ? আমি যদি বিয়ে না করি ?

শোনো কথা। যদি বিয়ে না করি। তা কি কখনো হয়। বিয়ে না করলে তোকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

নয়নদার ঠাকুমা তখনো বেঁচে। তিনি নাতির নাম রেখেছিলেন নয়নমণি। নয়নমণি থেকে বিবর্তনসূত্রে নয়ন মোহন। বুড়ী বললেন, তোর বাপও বলত, বিয়ে করব না, সন্ন্যাসী হবো। কী বলে ওকে, ওই যে কী আনন্দ ? বেবাক আনন্দ। বাপ বিয়ে না করলে তুই হতিস কী করে ? বল আমাকে, বল।

বৌদিদিরা বললেন, দেখছো তো আমাদের দশা। রূপ থেকেও নেই। কেন না রুপো নেই। গয়না পর্যন্ত বন্ধক। আসল জিনিস হলো টাকা। তোমার শ্বশুরের তা আছে। এমন পাত্রী হাতছাড়া করতে নেই। করলে তোমায় বলব লক্ষ্মীছাড়া।

নয়ন মোহন বাড়ির অবস্থা জানতেন না। বৌদিদিদের কথায় হুঁশ হলো। তিনি ছিলেন রিয়ালিস্ট, তাই শেষ পর্যন্ত মত দিলেন। কিন্তু অন্তর থেকে তো দেননি। অন্তর কেন তা মানবে। সেইজন্যে বিয়ের পরের দিন তাঁর কাঁদুনি, এবং সেই উপলক্ষে আমাদের সান্ত্বনাবাণী।

আমরা যারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলুম, আমরা জানতুম, এ বিবাহে তিনি সুখী হবেন না। হতে পারেন না। কারণ আর সব বিষয়ে বাস্তববাদী হলেও বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁর পরম কাম্য ছিল তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী। কখনো কাউকে ভালোবেসে ছিলেন কি না বলতে পারবো না, কিন্তু যাকে তিনি ভালোবাসবেন, সে কেমন হবে তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের মাঝে মাঝে শোনাতেন।

বিয়ের পরে রসিকতা করে কে একজন তাঁকে বলেছিল, তুমিই জিতলে, যা চেয়েছিলে অবিকল তাই পেলে। তন্বী মানে রোগা, শ্যামা মানে কালো, শিখরিদশনা মানে পাহাড়ের মতো দাঁত, আর

পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মানে ফাটা তেলাকুচার মতো ঠোঁট দু'টির মাঝখানে অনেকটা ফাঁক'।

নয়নদা বেচারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল ও কথা শুনে। তাঁর সব চেয়ে মনে লেগেছিল আরেক জনের বক্রোক্তি, নয়ন, তুমি তো এখন চোখে অন্ধকার দেখছ!

আমরা, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে প্রকৃতিস্থ করি। নইলে তিনি হয়তো বিকৃতিবশত কিছু একটা করে বসতেন। আমি যে ঠিক কী কথা বলেছিলুম, আমার তা মনে ছিল না। তাঁর মনে ছিল দেখছি।

তোমার কথাই অবশেষে সত্য হলো, তিনি বললেন, কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হতো। এ যা হলো তা আরো মর্মান্তিক।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কী হয়েছে, নয়নদা? খারাপ কিছু নয় তো?

না, খারাপ কিছু নয়। সমূহ কুশল।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু নিরস্ত হলুম না। জানতে চাইলুম, তা হলে আরো মর্মান্তিক কেন?

তিনি বললেন, শোনো তা হলে।

"অতি বড় অভাগা যে আমি একটা
আমি কিনা পেয়ে গেলুম মনিব্যাগটা।"

সত্যেন দত্তের একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ মনে পড়ে? বিয়ের পরে আমার মনোভাব ধীরে ধীরে দাঁড়াল ঐ জাপানীটির মতো। আর কিছু না পাই, টাকার থলি তো পেয়েছি। এই বা কজন পায়! জীবিকার জন্যে আমাকে পরের চাকরি করতে হবে না, স্বাধীন ব্যবসাতে মূলধনের অভাব হবে না, ব্যবসায় ফেল মারলেও সংসার অচল হবে না, লক্ষ্মী হলেন অচলা। এ কি কম কথা! এত যে দুশ্চিন্তা ছিল এম. এ. পাস করে তারপরে কী করব, কোথায় স্থিতি পাব, সব দুশ্চিন্তা জল হয়ে গেল! সমবয়সীদের কেউ-কেউ এখনো স্থিতি পায়নি, খবর রাখো বোধ হয়। বিশ

বৎসর পরেও তাদের জীবনযাত্রা অস্থির। আর আমি সব দিক থেকে গুছিয়ে নিয়েছি। স্বাস্থ্য আমার এত ভালো যে একদিনও অনিদ্রা হয় না। আর তোমার তো শুনি কোনোদিনই সুনিদ্রা হয় না। তুমি কৃপার পাত্র। কালো মেয়ে বিয়ে করলে ভালো থাকতে।

জানো তো, আমাদের কেমন খানদানী বংশ। আগেকার দিনে সুন্দরী মেয়ে আমরা লুট করে এনে বিয়ে করতুম। তারপরে কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনি। বর্ণকৌলীন্য যখন উঠে গেল, তখন কাঞ্চনকৌলীন্য আমাদের ঐ কাজে লাগল। আমরা পণ নিতুম না, যৌতুক নামেমাত্র নিতুম। কিন্তু বৌ আনতুম সুন্দরী দেখে। এর ব্যতিক্রম যে হতো না তা নয়। কিন্তু এমন কোন নিয়ম আছে কি, যার নিপাতন নেই? কিন্তু তা বলে আমার নিজের বেলা ব্যতিক্রম হবে, এ আমি কল্পনা করিনি। আমার দাদারা সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছেন। আমার ধারণা ছিল, আমারও জন্মসত্ত্ব সুন্দরী ভার্যা। বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, সম্পত্তি যদি মর্টগেজ করে না যেতেন, তা হলে এ অঘটন ঘটত না। বংশের ব্যতিক্রম হয়ে নাম হাসাতুম না।

তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমার মতো ভাগ্যবান বন্ধুদের সবাইকেই আমি হিংসা করি। যেদিন তোমার বিয়ের খবর পড়ি, সেদিন যেন বুকে শেল বাজল। বিশ বছর দেখা হয়নি বলে আশ্চর্য হচ্ছো। এ জীবনে দেখা হলো এইটেই আশ্চর্য। তুমি জিতেছ, আমি হেরেছি। তোমার সঙ্গে কোন্ মুখ নিয়ে আমি দেখা করতুম। আমারই মতো যারা দুর্ভাগা, তাদের সঙ্গে দেখা হয় বছরে বা দু'বছরে একবার। কেউ-কেউ আবার এমন হতভাগা যে, সেই জাপানী বেচারার মতো মনিব্যাগটা তুলে নিয়ে দেখে :

'ট্রামগাড়ী চাপাপড়া ব্যাঙ-চ্যাপটা।'

গোপেনকে মনে আছে তোমার? আবগারি সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ হয়েছে এখন। গোপেন আমাকে রামপ্রসাদী গান গেয়ে শোনাত।

বলত, কালো ভুবন আলো। তেমনি তার সাজা পেতে হলো নিজেকে। বিয়ে হলো কালো মেয়ের সঙ্গে। আশা করেছিল, শ্বশুর তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে যাবেন, কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করে দিয়ে গেলেন আরো কয়েকটি কৃষ্ণকলির অভিভাবকত্ব।

গোপেন কিন্তু আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছিল। তাকে বলতুম, আচ্ছা, কালো না হয় আলো, কিন্তু খাঁদা কী করে টিকলো হবে? সে বলত, চীন দেশে খাঁদা নাকের উপর তিন হাজার বছর ধরে কবিতা লেখা হয়ে আসছে। ও দেশের রামপ্রসাদী গান কালী ভক্তির নয়, খাঁদী ভক্তির। তাও যেন হলো, কিন্তু দাঁত বার করা কি সহ্য হয়? যেন খেতে আসছে! গোপেন বলত, এর উত্তর দিয়ে গেছেন জয়দেব কবি। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী'। খেতে আসছেন না, বলতে আসছেন যে—তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমার প্রিয়া। বচনের উল্লাসে জ্যোৎস্নার মতো ফুটে উঠছে শুভ্রকান্তি দর্শন।

মানুষের বাইরেটা কিছু নয়, ভিতরটাই আসল। রূপ কিছু নয়, গুণই প্রধান। এ কথা আমি কত লোকের মুখে শুনেছি, বিশ্বাস করেছি, মুখ ফুটে বলেওছি, কিন্তু সান্ত্বনা পাইনি। রূপের স্বাদ কি গুণে মেটে? রূপ ক্ষণকালের, গুণ চিরকালের। তা বলে কি ক্ষণপ্রভার মূল্য কিছু কম? যখন শুনতুম, বৌটি বড় গুণের, তখন খুশি হতুম খুবই। কিন্তু তার চেয়েও খুশি হতুম যদি শুনতুম, চোখ দু'টি তো বেশ। গুণের প্রশংসা যত শুনতুম, রূপের সুখ্যাতি তার সিকির সিকিও নয়। রাগ ধরত, যখনি ওরা বলত, বৌ-মানুষের রূপের প্রয়োজন নেই। রূপের প্রয়োজন নাকি রূপোপজীবিনীর। তবে বৌদিদিদের আনা হয়েছিল কী

দেখে? তাঁদের রূপবন্দনায় পঞ্চমুখ যাঁরা, তাঁরাই আবার রূপের অসারত্তা ঘোষণা করতেন আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ত তোমার উক্তি। রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন। সবাইকে দিয়েছেন তো কৃষ্ণাকেও দিয়েছেন। তা হলে আমার চোখে পড়ে না কেন? লোকের চোখে পড়ে না কেন? এর উত্তর, দেখবার চোখ তিনি সবাইকে দেননি। আমাকে দেননি, লোকেদেরও দেননি। কৃষ্ণার রূপ আছে, আমাদেরই চোখ নাই। এ কি সত্য? অনেক ভেবেছি, কিন্তু সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি। ধরে নিয়েছি, ওটা একটা স্তোকবাক্য। এ কথা বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা জানিয়েছ। ওটা তোমার বন্ধুকৃত্য। কিন্তু বন্ধুতা নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য নয়। তোমার বিয়ের পর মনে হয়েছিল তুমি আমাকে পরিহাস করে ওকথা বলেছিলে। ওটা তোমার শ্লেষ। কিছুকাল তোমার উপর বিরূপ হয়েছিলুম। তোমাকে আক্রমণ করে একটা প্রবন্ধ লিখে মাসিকপত্রে পাঠিয়েছিলুম। তারা ছাপলো না। ভাগ্যিস ছাপেনি।

ক্রমে আমার প্রতীতি হলো যে, রূপবোধ একটা সংস্কার। জনম অবধি আমি রূপ নিরীক্ষণ করেছি, সেইজন্যে কৃষ্ণাকে মনে হচ্ছে কুরূপা। ধরো, যদি শিশুকাল থেকে কুরূপ নিরীক্ষণ করতুম, তা হলে কি কৃষ্ণাকে মনে হতো কুরূপা? না, তা হলে তাকে মনে হতো আর সকলের অনুরূপ।

এই প্রতীতির পরে আমি একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হতে চাইলুম। কেন, সে কথা খুলে বললুম না। বৌদিদিদের মুখদর্শন করে তারপরে কৃষ্ণার মুখদর্শন করলে কৃষ্ণাকে কুরূপা দেখাবেই। এর একমাত্র প্রতিকার বৌদিদিদের মুখদর্শন না করা।

যে বাড়িতে কেবল কৃষ্ণাই একমাত্র নারী, সে বাড়িতে সুরূপা কুরূপার বৈষম্য নেই। দেখলুম, কৃষ্ণাকে আমার তত খারাপ লাগছে না। তার চোখ দু'টি সত্যিই সুন্দর। তার প্রোফাইলের ফোটো নিয়ে দেখা গেল মন্দ মানায় না।

রূপ বলতে আমরা শুধু গায়ের রং আর মুখের সৌষ্ঠব বুঝি। অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। কৃষ্ণা ক্ষীণমধ্যা, এখানে তার জিৎ। সে সুকেশী, এখানে তার জিৎ। তার তনুরেখা বঙ্কিম ও সুমিত, এখানে তার জিৎ। তার গড়ন মাংসল নয়, দীঘল, এখানে তার জিৎ। তার হাতের আঙুল, পায়ের পাতা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। এখানে তার জিৎ। এভাবে বিশ্লেষণ করলে কৃষ্ণার জিৎ অনেক বিষয়ে। কিন্তু সৌন্দর্য তো বিশ্লেষণ করবার বস্তু নয়। আর আমিও নই সম্পূর্ণ নিরাসক্ত সমালোচক। ও যদি আমার না হয়ে পরের হতো, আমি ওকে রূপের পরীক্ষায় পাস মার্ক দিতুম। কিন্তু আমার হয়েই বেচারা ফেল করেছে। এইটেই মর্মান্তিক।

একটি ছেলে, একটি মেয়ে হবার পর আমি বাইরের বারান্দায় পৃথক শয্যা পাতলুম। কৃষ্ণা ভেবেছিল দু'দিনের বৈরাগ্য। একটু হেসেছিল, কিন্তু মাসের পর মাস কাটে, আমার সংকল্পের পরিবর্তন হয় না। আমার মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। আমি মন স্থির করে ফেলেছিলুম। ওদিকে কৃষ্ণার মনেও দোটানা। সে একা শুয়ে শান্তি পায় না। একদিন শেষ রাত্রে সে এলো আমার কাছে। এসে লুটিয়ে পড়ল। তার কণ্ঠে দুর্জয় ক্রন্দন। ধরা গলায় বলল, তুমি কি আর আমার সঙ্গে শোবে না?

তাকে আমি অনেক করে বোঝালুম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শেষে

রাগ করেই বললুম, আমি অন্য কোথাও চলে যাব, হিমালয়ে কিম্বা পণ্ডিচেরীতে।

শুনে সে কেঁদেই আকুল। পরের দিন জেদ ধরল, আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এ বাড়িতে যেই আসে সেই জানতে চায়, আলাদা বিছানা কেন? লজ্জায় মরে যাই।

বাপের বাড়ি থেকে কয়েক মাস পরে আপনিই ফিরে এলো। বাপের বাড়িতেও সকলে জানতে চায়, আলাদা থাকার কারণ কী? লজ্জায় সে বাঁচে না। একদিন আমাকে মিনতি করে বলল, অন্তত এক বিছানায় শোও। মাঝখানে থাকুক ছেলেমেয়ে। লোকলজ্জা থেকে বাঁচাও।

তাই হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'জনের মনে সেই যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে আর বুজল না। এ যেন নেহাৎ একটা লোক দেখানো সেতুবন্ধ। সকলে জানল, আমরা একটি সুখী ও সম্ভ্রান্ত দম্পতি। আমরা জানলুম যে, আমাদের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। অশ্রুজলের সাগর।

ভগবানকে ডেকে কত বলেছি, প্রভু, ওকে একটি দিনের জন্যে রূপবতী করো, দিনের আলোর মতো রূপ দাও। চিত্রাঙ্গদাকে দিয়েছিলে একটি বছরের জন্যে, কৃষ্ণাকে দাও একটি দিনের জন্যে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় নয়ন দা চমকে উঠলেন।

তোমার ওটা কি ঘড়ি না ঘোড়া হে!

আমি বললুম, ও ঘড়ি ফাস্ট চলছে।

কিন্তু আমার আর বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। আমরা আজ রাত্রের ট্রেনেই যাচ্ছি, যেটা দশটায় ছাড়ে।

আর একটা দিন, আমি অনুরোধ করলুম, এখানে থেকে গেলে পারতে। তোমার তো চাকরি নেই।

চাকরি নেই, কিন্তু যা আছে তা চাকরির ওপরে। মজদুররা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। এখন গিয়ে তাদের মানভঞ্জন করতে হবে।

এরপরে তিনি তাঁর কাহিনীর খেই ধরলেন।

কৃষ্ণা জানত যে, তার রূপের অভাব আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছে, সেইজন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করত রূপের অভাব নিজের গুণ দিয়ে পূরণ করতে। অন্য কেউ হলে স্নো-পাউডার মেখে সঙ সাজত, নানা রঙের শাড়ি ব্লাউজ পরে প্রজাপতি বনত। কিন্তু সাজ-পোষাকের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না বলে তারও লক্ষ্য ছিল না কোনদিন। তার লক্ষ্য ছিল গুণের উপর। সে তার লক্ষ্যভেদ করেছিল, কিন্তু তবু আমার মন পায়নি।

এর কারণ, রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। রূপের অভাব রূপ দিয়েই পূরণ করতে হয়। তা, যে পেরেছে সে অসাধ্যসাধন করেছে। এই অসাধ্যসাধনে কৃষ্ণার সাধনা ছিল না। অন্য কোন সাধনা এর স্থান নিতে পারে না। তাই তার গুণের সাধনা আমাকে জয় করেনি। উমার তপস্যা শিবের মতো বিরূপাক্ষের জন্যে, আমার মতো সুরূপাক্ষের জন্যে নয়। আমার নয়ন যদি সায় দেয় তো, মন সায় দেয় না। মন যদি সায় দেয় তো, দেহ সায় দিতে চায় না। গুণ দিয়ে কি বিকার দূর করা যায়?

আমি যে বিকার বোধ করি, এ কথা তাকে মুখ ফুটে বলিনি। সে বুদ্ধিমতী, নিজেই বুঝে নিয়েছিল। তাই একদিন আমাকে বলেছিল, তুমি আর একটি বিয়ে করো, বা যেখানে ইচ্ছা যাও। এমন করে ক'দিন চালাবে?

এর উত্তরে আমি বলেছিলুম, পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে চাইনে। যেমন চলছে চলুক।

বস্তুত আমার একদণ্ড ফুরসৎ ছিল না। দিনরাত কাজ আর কাজ। হোসিয়ারীর কারখানা খুলেছিলুম। দেখাশোনা সমস্তই করতে হতো আমাকে। স্লীপিং পার্টনার আমার তিন সম্বন্ধী, ওয়ার্কিং পার্টনার আমি। কখন খাই, কখন শুই, কিছুই ঠিক নেই।

শুধু এই ঠিক যে বছরের শেষে লাভ দেখাতে হবে। লাভ যদি না দেখাতে পারি তো সম্বন্ধীরা টাকা তুলে নেবেন। তখন আমি মূলধন পাব কোথায় ? লাভ আমাকে দেখাতেই হবে।

কৃষ্ণা যখন উপলব্ধি করল যে, তার গুণের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, রূপের সাধনাও সুদূরপরাহত, তখন আমাকে একা রেখেই ছেলেমেয়ে সমেত দার্জিলিং চলে গেল। সেখানেই তারা লেখাপড়া শিখবে ও মানুষ হবে। আমি দুঃখিত হলুম, কিন্তু বাধা দিলুম না। ওর একটা পরিবর্তন দরকার। কে জানে, হয়তো শীতের দেশে বাস করে রংটা এক পোঁচ ফরসা হতে পারে। যথা লাভ।

অকস্মাৎ স্বাধীনতা পেয়ে আমার অবস্থাটা হলো বৈপ্লবিক। যেমন হতে যাচ্ছে ভারতবর্ষের। কী যে করি স্বাধীনতা নিয়ে ? বহুকালের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে, বঞ্চিত জ্বালা নিয়ে কী যে করি ?

তুমি শুনে অবাক হবে যে, কিছুই করলুম না। তার কারণ, যাই করতে যাই তাই মনে হয় তুচ্ছ। মনে হয়, এমন কিছু করা উচিত, যা কেউ কোনদিন করেনি। যা উচ্চাদপি উচ্চ, তেমন কিছুর নাগাল পেলে হয়। কাব্যের নায়িকারা হোসিয়ারীর কল পরিদর্শন করতে এলে হয়। ট্রয়ের হেলেন, বৃন্দাবনের রাধা, ইরানের লয়লা, চিতোরের পদ্মিনী....কোথায় দেখা পাই এঁদের ? কেউ কি এঁরা পথ ভুলে বক্তিয়ারপুর আসবেন না ?

তোমার মনে আছে কিনা জানিনে, কলেজে আমার প্রিয় কবি ছিলেন টেনিসন, আর প্রিয় কবিতা ছিল 'সুন্দরী নারীদের স্বপ্ন'। অবশ্য আরো প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস। কিন্তু টেনিসন একটু বিশেষ অর্থে প্রিয়। ঐ 'সুন্দরী নারীদের' জন্যেই। হায় ! এত যে তাঁদের নাম জপ করলুম, রূপ ধ্যান করলুম, তবু তো তাঁদের

কারো করুণা হলো না। যেন লাইনে ট্রেন দাঁড়ালেই আমার মনে হতো, এই ট্রেনেই তিনি এসেছেন, এসে আমাকে খুঁজছেন। সব কাজ ফেলে স্টেশনে ছুটে যেতুম, গিয়ে নিরাশ হতুম। লোকে বলাবলি করত, ফী ট্রেনেই এঁর জানানা আসছেন। বাউরা হয়েছেন! আমি কিন্তু ওসব গায়ে মাখতুম না। নিরাশ হলেও যেতুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখি, ট্রেন থেকে নামছেন ট্রয়দেশের হেলেন নয়, বৃন্দাবনের রাধাও নয়, দার্জিলিং-এর কৃষ্ণা। ছেলেমেয়েদের দার্জিলিং-এর স্কুলের বোর্ডিংএ রেখে এসেছেন। সেখানে তারা সুখে আছে। আমার না-জানি কত অসুবিধা হচ্ছে, এ কথা ভেবে তাঁর অস্বস্তি বোধ হলো, তাই চলে এলেন। যাক, আমাকে বাঁচালেন। লোকে স্বীকার করল, না, লোকটা বাউরা নয়। আর আমিও স্বীকার করলুম যে, স্বাধীনতার ঝক্কি পোষায় না। তার চেয়ে স্ত্রীর হাতের মোচার ঘণ্টই মিষ্টি!

কিন্তু মোচার ঘণ্ট এবার মিষ্টি লাগল না। দেখা গেল, কৃষ্ণা কেবল বসে চিঠি লিখছে। ধরে নিলুম, ছেলেমেয়েদের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, চিঠি লিখে মনের ভার হালকা করছে। কিন্তু প্রতিদিন ওর নামে একই মানুষের লেখা খামে-বন্ধ চিঠি আসতে দেখে সন্দেহ জাগল, কার হাতের লেখা এসব। মেয়েলি হাতের কি না? কয়েকবার ইতস্তত: করে ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলুম তাকে। সে বিনা বাক্যে উত্তর দিল চিঠিগুলো আমার সামনে রেখে।

বিস্ময়! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! উর্দু ভাষায় একজন উদীয়মান কবি দার্জিলিং-এ বসে গজল লিখছেন। সাকী বলে যাকে সম্বোধন করছেন, সে আমারই কৃষ্ণা! সাকীর কাছে নিত্য নূতন গজল আসছে স্বাক্ষরিত হয়ে। প্রেরণাও ফুরোয় না, গজলও ফুরোয় না। বলা

বাহুল্য উর্দু আমরা দুজনেই জানতুম। আমিই যে শিখিয়েছিলুম কৃষ্ণাকে। স্বয়ং শিখেছিলুম মুসলমান বন্ধুদের কাছে। সে বিদ্যা যে এ ভাবে কাজে লাগবে কল্পনা করিনি। হতভম্ব হলুম। কবির নাম হাফিজ দিয়ে আরম্ভ। তাঁকে তাই হাফিজ বলে উল্লেখ করব।

হাফিজ নাকি পতঙ্গের মতো রওশনের রূপমুগ্ধ। রূপের বর্ণনা যা দিয়েছেন, তা আমার পক্ষে আবিষ্কার। এত রূপ যে আমার অগোচরে ছিল, তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বিশ্বাস না করেও পারিনে। কারণ, কবি যা লিখেছেন তা পরিহাসের সুরে নয়। তবে কি এ কথা সত্য যে, আমার চোখে যে রূপহীনা, অন্যের চোখে সে রূপসী? এও কি কখনো সত্য যে কুরূপা বলে কেউ নেই, ওটা দৃষ্টিবিভ্রম, বা চোখের ধাঁধাঁ?

তখন আমার মনে পড়ল তোমার উক্তি। ভগবান রূপ সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ। এই উর্দু কবি একজন শিল্পী। ইনি তাই কৃষ্ণার রূপ দেখে রওশনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হায়, আমিও যদি শিল্পী হতে পারতুম! আমার শিল্পরচনার দৌড় বক্তিয়ারপুরের গণেশমার্কা গেঞ্জি ও হনুমানমার্কা মোজা। এই চোখে ভগবানের দেওয়া রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। চোখ দু'টোকে বদলে নেওয়া চাই। ভাবলুম, কিছুদিন হনুমান ও গণেশের ধ্যান ছেড়ে গৌরীশঙ্কর কাঞ্চনজঙ্ঘা অবলোকন করব। স্ত্রীকে বললুম, চল, আমরা দার্জিলিঙে যাই। দেখে আসি, টুবলুকে—টুটুকে।

আহা! কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। কী করে তার বর্ণনা দেব! আমি তো কবি নই। কিন্তু এও আমি বুঝতে পারিনে যে, কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো নারী থাকতে কৃষ্ণার মতো নারী কী করে বন্দনা পায়! কবিদের কি সত্যিকার সৌন্দর্যবোধ আছে? আমার তো মনে হয় না।

হাফিজকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। জরিদার শেরওয়ানী ও চুড়িদার পায়জামা পরে তিনি এলেন। শুনলুম, তিনি নাকি নবাব-ঘরানা। মুর্শিদাবাদে বাড়ি। পরের মুখে নিজের স্ত্রীর রূপবর্ণনা তো শোনোনি? তুমি কী করে বুঝবে আমার ব্যথা? আমার যা লাগছিল, আমিই জানি। শুধালুম, আচ্ছা, এ কি তবে সবই সত্য, হে আমার স্ত্রীর ভক্ত···মনে আছে তো রবীন্দ্রনাথের সেই কৌতুকের কবিতাটি? 'চিরভক্ত'-কে 'স্ত্রীর ভক্ত' করেছি।

কবি বললেন, কাব্যের সত্য জীবনের সত্য এক নয়। যেমন চিত্রের সত্য ফোটোগ্রাফের সত্য এক নয় এও সত্য, আবার সেও সত্য।

কৃষ্ণা সেখানে ছিল না। থাকলে হয় তো আঘাত পেতো। কেন না তার ইতিমধ্যেই ধারণা জন্মেছিল, সে যথার্থই সুন্দরী। দুই অর্থে—কাব্যে ও জীবনে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে নয়নদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি তাকে অভয় দিলুম যে ট্রেন ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। তখন তিনি পূর্বানুবৃত্তি করলেন:

দার্জিলিং-এ আমার চোখ খুলে গেল দেখলুম, কৃষ্ণার গায়ের রঙ এক পোঁচ ফরসা হয়নি বটে, কিন্তু রঙটা ধরেছে ভিতরে। সে যেন এতদিন পরে আপনাকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে যে, সে সুন্দরী। সাতাশ কি আঠাশ বছর বয়সে যদি কোন মেয়ে প্রথম আবিষ্কার করে সে সুন্দরী, তাহলে তার সেই আবিষ্কার তাকে বিপ্লবের আস্বাদন দেয়। এ যেন একটা আগস্ট বিপ্লব। হিংসার ক্ষমতা নেই বলে, দীর্ঘকাল অহিংসার অনুশীলন করার পর অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল, আমরা হিংসার ক্ষমতা রাখি। দেখছ তো দেশ কেমন রক্ত পিপাসায় অধীর হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ না একটা আণবিক বোমা কলকাতা কি বম্বেতে পড়ছে, ততক্ষণ এ পিপাসার ক্ষান্তি নেই।

কৃষ্ণাকে নিয়ে আমার দশা হল মহাত্মার মত। কী করে তাকে বোঝাই যে তার আবিষ্কারটা কাব্যের সত্য, জীবনের সত্য নয়। যে এ কথা বোঝাতে পারত, সে হাফিজ। হাফিজ ক্রমে দুর্লভ হলো। তার চিঠিও একসময় বন্ধ হলো।

কিন্তু ক্ষতি যা করে গেল, তার জের চলতে লাগল। কৃষ্ণা বিশ্বাস করল, হাফিজের জবানবন্দী সাচ্চা, আর আমার জবানবন্দী ঝুটা। আমি তাকে এগারো বছর ধরে ঠকিয়ে এসেছি। আমি প্রবঞ্চক। সে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকায় না। আমিও কেমন যেন অপরাধী বোধ করি নিজেকে। একে তো আমাদের দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, এখন মানসিক সম্বন্ধেও ভাঙন ধরল।

দার্জিলিং থেকে একসঙ্গেই ফিরি। আমি প্রস্তাব করেছিলুম, সে যদি দার্জিলিং-এ একা থাকতে চায় তো থাকতে পারে।

সে নাকচ করল। বোধ হয় লোকনিন্দার ভয়ে।

বক্তিয়ারপুরে ফিরে আমি আমার কাজকর্মে ডুব মারলুম। আর সে চলল উজান বেয়ে। বয়স তার দিন-দিন কমতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাটায় আয়নার সামনে। চুল বাঁধে, চুল খোলে, আবার বাঁধে। শাড়ি পড়ে, শাড়ি ছাড়ে, আবার পড়ে। সাজ-পোষাকের বাহার ছিল না, শুরু হলো। স্নো-পাউডার মেখে জুতো পালিশের মতো চেহারা হলো। তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই। যার টাকা আছে, সে যদি দু'হাতে ওড়ায় তো আমার কি?

কিন্তু মাঝখানে ছেলেমেয়ে না শোওয়ায়, সে একেবারে আমার কোলের কাছে এসে শোয়। আশা করে, আমি তার রূপ দেখে ভুলব। ক্ষণকালের জন্যে ভুলিনি যে তা নয়, কিন্তু সেটা আমার নিজের দুর্বলতা, তার মাদকতা নয়। সে কিন্তু ধরে নেয় যে তার মধ্যে অপূর্ব

াহিনীশক্তির সঞ্চার হয়েছে। অমনি মোহিনীশক্তির অনুশীলনে ত হয়। এদিকে আমি বিকারবোধে অস্থির। কী করে পরিহার রব ভেবে পাইনে।

আর একটি সন্তান হলো। এটি ছেলে। খুব খুশি হলুম দু'জনে।

আমি বললুম, আর কেন, এখন থেকে পূর্ব ব্যবস্থা বহাল হোক।

সে কিছু বলে না, মুচকি হাসে।

ছেলের জন্যে ছোট্ট একটা বেবী-কট কেনা হলো। ছেলেটি সখানে শোয়। আর আমি প্রতি রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই শোচনীয় ংক্তিগুলি আবৃত্তি করি।

'রে মোহিনী, রে নিঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস্ হরে
আমার যামিনী।'

অগত্যা পণ্ডিচেরীর কথা বলাবলি করতে হলো। হিমালয়ে হাপ্রস্থান করতে পারি, আভাসে ইংগিতে জানালুম। কিন্তু কে িশ্বাস করবে ও কথা। আমার হোসিয়ারী ফাঁপতে ফাঁপতে টেক্স্‌- াইলের আকার ধারণ করেছিল। কটন মিলের উদ্যোগে ায়োজনে জীবনটা মধুর হয়েছিল। রূপ না হয় পাইনি, কিন্তু রূপো পেয়েছি অঢেল, অজস্র। রূপের মায়া আমাকে ধরে রাখতে ারবে না, কিন্তু রূপোর মায়া? দেখা গেল, কামিনীর চেয়ে কাঞ্চনে াকর্ষণ কম নয়। থেকে গেলুম কাঞ্চনের টানে। কৃষ্ণা কিন্তু ওরালো কামিনীর টানে। তার মুখে হাসি আর ধরে না। াহিনীশক্তির জয়।

সেই হাড়িকাঠ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই দেখে গুরু ডেকে ানে মন্ত্র নিলুম গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের। কৃষ্ণাকে সাধলুম, তুমিও নাও।

তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। কী যে হলো তার জানিনে। ন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা। পাড়ায় পাড়ায় গল্প রে বেড়ায় আহার নিদ্রা ভুলে। রাত্রে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে

আসি, বন্ধ করে রাখি। চিকিৎসকের পরামর্শে গুরুর অনুমতি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আবার পাতাতে যাই। ফল হয় উলটো। কাতর সুরে বলে, তুমি বাপের বয়সী, তুমি মাননীয় বৃদ্ধ। তোমার কি শোভা পায় এ অধর্ম।

আমি নাকি তার বাপের বয়সী! হে হরি! আমি নাকি মাননীয় বৃদ্ধ! হে ঈশ্বর!

নয়নদা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কাঁদো-কাঁদো সুরে বললেন, পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে আমার নামে রটায়, আমি নাকি তাকে সুন্দরী তরুণী পেয়ে তার ওপর বলপ্রয়োগ করি। বুড়ো বয়সে আমার নাকি ভীমরতি হয়েছে।

ওহো-হো! আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে না ভায়া। বেলডাঙ্গায় আমাদের দু'নম্বর মিলটা তৈরী হয়ে গেলেই আমি চোখ বুঁজব।

সবাই বলছে ওকে পাগলা গারদে পাঠাতে। কিন্তু সেটা হবে যথার্থই অধর্ম। না, সে আমি পারব না। কিন্তু এও আমার পক্ষে অসহনীয়। আমার মান গেল, আমি হেয় হয়ে গেলুম লোকচক্ষে।

আমি তাঁর চোখ মুছিয়ে দিলুম সেকালের মতো। এক হোস্টেলে এক ঘরে বাস করতুম আমরা। রাত কেটে যেত সুন্দরী নারীদের স্বপ্নে। নয়নদার নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল, সুন্দরী নারী তাঁর ভাগ্যে অবধারিত। সেটা তাঁর জন্মস্বত্ব। জন্মস্বত্বের খণ্ডন হলে দেখে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন বিশ বছর আগে। চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলুম আমরা কয়েকজন বয়স্য।

সান্ত্বনাচ্ছলে সেবার বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। এবার কী বলব? বলার আছে কী

তবু বললুম, নয়নদা, তুমি কবিদের মতো মিথ্যাবাদী নও বলেই এরকম ঘটল। মিথ্যা বললে না কেন হাফিজের মতো? গজল লিখলে না কেন উর্দু বাংলা যে কোনো ভাষায়? লিখিয়ে নিলে না কেন তোমার মিলের বিজ্ঞাপন বিভাগের সাহিত্যিকদের দিয়ে এখনো সময় আছে হয় তো।



বসন্তে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সন্তের হাওয়া দিতে আরম্ভ হইয়াছে। দুপুরটা একটু উত্তপ্ত হইয়া ঠে, বোধ হয় পাহাড়ে জায়গা বলিয়া; সকাল আর সন্ধ্যায় একটা ঝিরঝিরে হাওয়া দেয়—তাপে-শৈত্যে মিঠা—কখনও বোধ হয় একটু হুয়ার গন্ধ, কখনও বা আম্র-মুকুলের গন্ধের আমেজ,—ইঙ্গিত মাত্র, বং ব্যক্তের চেয়ে ইঙ্গিতের মতই মন মাতানো।....কি যে মনে হয় ঠিক পষ্ট বোঝা যায় না, তবে নিজেকে আর চারিদিকের সব জিনিসকে বশ ভাল লাগে—পুরানো পর্যন্ত যেন নূতন রূপে দেখা দেয়।

চেঞ্জের সময় শেষ হইয়া আসিল, আর ছুটি নাই। সেই কথাই ইতেছিল। শীলা বলিতেছে, 'বেয়াক্কিলের মতো কথা ব'ল না, াহাড়ে শীতে হি-হি করে তিনটে মাস কাটিয়ে যেই শীতটা কাটব-াটব করছে, হুকুম হ'ল, 'চল'···আমি যাব না। আমি কারুর কুমের দাসী নই।'

পুলিন বলিল, 'হুকুমের দাসের প্রতি কি আদেশ হয়? একাই েতে, না চাকরি ছেড়ে এইখানে বসে থাকতে?'

'যাকে ছাড়াটা তাঁর পক্ষে সহজ তাকেই ছাড়ুন তিনি, চাকরি কন ছাড়তে যাবেন? মোট কথা, আমি যাব না এখন।'

শীলা জানালার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

সামনে···অনেক দূরে একটা টানা পাহাড়ের কুঞ্চিত রেখা; ধূসর ান্ধ্য আকাশের গায়ে একটা নীল পর্দা যেন। তাহার পরই সমস্ত

জায়গাটা ঢেউ খেলানো ; কোথাও একটা পাহাড়ী নদীর বাঁক—বালুর উপর অস্তরবির কিরণ ঝিকমিক করিতেছে। একটা ঢিবির উপর পাঁচ-ছয়টা পলাশ গাছ, ফুলের দেওয়ালী জ্বালিয়াছে। ওরাঁওদের একটা ছোট দল—পুরুষরা মেয়েদের থেকে একটু আলাদা—মেয়েরা খানিকটা যায়, একসঙ্গে খুব মিষ্টি সুরের কি-একটা গানের কলি একবার গাহিয়াই ছাড়িয়া দেয়—উঁচুনিচু জমির গায়ে সুরের স্রোত যেন ধাক্কা খাইয়া ফেরে।···পলাশ গাছের নিচে একটি যুবতী মেয়ে আর একটি যুবা একটু আটকাইয়া গেল—ফুলের দরকার পাড়িয়াছে। দলের মধ্যে থেকে কয়েকজন ফিরিয়া দেখিল ;—এদের দু'জনকে লক্ষ্য করিয়া একটা কি আলোচনা হইতেছে—হাসি আছে, বিদ্রূপও আছে বলিয়া মনে হয় যেন।···ওরা পুষ্প সঞ্চয়েই ব্যস্ত—মেয়েটা সঙ্গিনীদের পানে একবার ঘুরিয়া দেখিয়া হাসিল—নিটোল কালো মুখের ওপর পড়ন্ত রোদের হালকা আবীর ছড়াইয়া পড়িল।

শীলা একবার হঠাৎ ফিরিতেই দেখিল, পুলিন ঠিক পিছনটিতে দাঁড়াইয়া আছে ; ঘরের মাঝখান থেকে কখন নিঃসাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। শীলার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই মৃদুস্বরে বলিল, 'চমৎকার আছে ওরা দুটিতে।'

শীলার রাগ হইয়াছে, মুখ ঘুরাইয়া লইল। দম্পতির পানে নয়, অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। রাগের সময় সে এমন কিছু দেখিতে চায় না যাহাতে রাগ জল হইয়া যাইতে পারে। হাল্কা হওয়ার মত অবস্থা নয় মনের।

সময় সময় রাগও একটা সম্পত্তি, মানুষ ভোগ করে, হাতছাড় করিতে চায় না।

পুলিন মুগ্ধকণ্ঠে বলিল, 'থেকে যেতে আমারই কি অসাধ শীলা! কিন্তু কি মনে হয় জানো?'

শীলা উত্তর না দিলেও বলিল, 'মনে হয় বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে যদি ঐরকম ওরাঁও ছেলে হতাম একটা···'

শীলা চুপ করিয়াই রহিল ; দৃষ্টি পলাশতলায় অবাধ্যভাবেই

আটকাইয়া গেছে। ছেলেটা একবার দূরাগত সঙ্গীদের দিকে চাহিল,— তাহারা একটা বাঁকের আড়ালে লুপ্ত হইয়া গেছে। বোধ হয় আর কেউ কোথাও আছে কিনা নির্ণয় করিবার জন্য চারদিকে একবার নজর বুলাইয়া লইয়া ছোট্ট পল্লবযুক্ত একটা ফুলের গুচ্ছ মেয়েটির এলো খোঁপায় গুঁজিয়া দিতেছে। সেও ঘাড় নিচু করিয়া প্রসাধন গ্রহণ করিতেছে।…একটি অনবদ্য চিত্র।

নিজেকে আবার সচকিত করিয়া লইয়া শীলা বলিল, 'যার ওরঁাও হবার সাধ হয় সে হোক, আমি হতে চাই না।'

পুলিন বলিল, 'চাও বইকি।'

'কখনও নয়; কে বললে?'

'তোমার মন বলছে, শীলা।'

'ককৃখনো নয়।'

পুলিন একটা হাত শীলার কাঁধের উপর রাখিল। মুখটা একটু ঝুঁকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'এবার বলত, ককৃখনো নয়।'

এটা ওর একটা তুক্, সত্য কথা আদায় করিতে হইলে শীলাকে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করে। জ্বালাতন হয় শীলা, কিন্তু সংস্কারটা কাটাইয়া মিথ্যা বলিতে পারে না। শাস্ত্রে স্বামী-দেবতাকে স্পর্শ করিয়া কোনো রকম অসৎ খেয়ালই মনে করিতে মানা, মিথ্যা বলা তো দূরের কথা।… কোনো উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

জানালার বাহিরে অস্তরাগ আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেমেয়ে দু'টিতে পাশাপাশি চলিয়াছে। অনেকটা পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়া গতি ত্রস্ত। উচ্ছ্সল কথাবার্তা চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। দূর থেকে দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন আর মাটি মাড়াইয়া চলিতেছে না। ছেলেটা কোমরে গোঁজা বাঁশী তুলিয়া ধরিয়া একটা সুর তুলিল, কিন্তু মেয়েটার কথার দিকেই ঝোঁক বেশি, সুরে বাধা পড়িতে লাগিল।

রাগের উপর এ-দৃশ্য দেখা দুর্বলতা, কিন্তু শীলা চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না। পুলিন পাশের একটা ফুলদানি থেকে একটা মার্শেলনীল গোলাপ লইয়া শীলার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে-দিতে

আবার মুখের পানে ঝুঁকিয়া বলিল, 'বল না শীলা, হয় না ইচ্ছে?… এই আমি এই রকম বুনো হয়ে যদি বনের ফুল গুঁজে দিই এলো খোঁপায়?'

শীলা কতকটা যেন অবশ হইয়াই স্বামীর গায়ে একটু এলাইয়া পড়িল। স্বামীর কথার সোজা উত্তর না দিয়া বলিল, 'নাও না ছুটি গো একটু। সত্যি বলছি, এ জায়গাটা ছেড়ে এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।'

বাইরের বারান্দায় কাহার পায়ের খস্-খস্ আওয়াজ হইল। শীলা নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া আবার জানালায় ভর দিয়া দাঁড়াইল। পুলিনও পাশে গিয়া দাঁড়াইল বলিল, 'তুমি বলছ—দরখাস্ত দিয়ে দেখব কাল; কিন্তু বৃথা, গতবারেই সায়েবের রিমার্ক ছিল আর কোন মতেই এক্সটেন্‌শন্ দেওয়া হবে না। আইবুড়োর মরণ, বোঝে না তো আমাদের দুঃখ।'

একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। খানিকটা চুপচাপের পর শীলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পুলিন তাহার মাথার ফুলটা আরও একটু বসাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'শীলা, সেই গানটা গাও, গাইবে?… সেই যে 'রঙের খেয়াল জাগল হঠাৎ বাতাসে'…'

বাইরের বারান্দায় ঝিয়ের পায়ের খস্‌খসানি শোনা গেল। শীলা বলিল, 'হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, গান!…আমার লজ্জা করে বাপু। ঝি-চাকর ঘুরছে…'

পুলিন বাঁ হাত দিয়া বধূকে আলগাভাবে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, 'শীলা, কতটুকু জীবন? তার মধ্যে কতটুকু বসন্ত, তাকে পাবার সুযোগ আরও কতটুকু আসে জীবনে? সংকোচের জায়গা নেই। দেখলে না, পথ চলতে-চলতে হঠাৎ ফুলের সন্ধান পেয়ে ওরা দল থেকে নিঃসংকোচে কেমন আলাদা হয়ে কোঁচড় বোঝাই করে নিলে? বেশ গুছিয়ে ব'সে জীবনকে উপভোগ করতে ক'জন পায় শীলা? এই রকম চলতে-চলতে পথের ফুল কুড়িয়ে না নিলে আপসোস থেকে যায়।…আস্তে আস্তেই গাও না।'

'না, আমার কেমন লজ্জা করছে।…ওগো, একটা কথা জানো?

ঝিটা আমাদের বড্ড দেখে বাপু। ক'বার আমার সন্দেহ হয়েছে, বলব-বলব করে তোমায় বলা হয়নি।'

'কি আর এমন বে-আইনী কাজ করে ওরা? আমরা দেখবার যুগ্যি—দুটিতে যখন একসঙ্গে হই, তখন আরও দেখবার যুগ্যি হই, দেখবে না?'

শীলা বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ওমা, তাই বলে হাঁ করে দেখবে ওরা! ভাল লাগে তোমার?'

'খুব ভাল লাগে। গাও তুমি।...শীলা শুনছ, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে।'

শীলার মন অন্যদিকে ছিল, হঠাৎ ডাক দিয়া উঠিল, 'ঝি!'

যেন মনে হইল, কে পা টিপিয়া-টিপিয়া বারান্দার ও-প্রান্তে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেইখান থেকেই ঝিয়ের গলায় উত্তর হইল, 'আমায় ডাকছ দিদিমণি? আসি।'

বেহারী মেয়ে, কিন্তু অনেকদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীতে পুলিনদের বাড়িতে আছে, বেশ বাংলা বলিতে পারে, শীলার দেওয়া শাড়ি আংরাখা পরিয়া বাঙালীর মত থাকে। বাংলা গানও শিখিয়াছে, শীলার কাছে গায় কখনও-কখনও।

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া শীলা মৃদুহাস্য করিল। ঝি আসিলে প্রশ্ন করিল, 'রামলগন কোথায়? আর সদানন্দ?'

ঝি একটু মুখ কুঁচকাইয়া বলিল, 'এ বাবুকে তো দেখছি না সেই থেকে। একটু টহল দেওয়া রোগ আছে তো?...সদানন্দ রাঁধছে।'

ঝি যেখান থেকে সাড়া দিয়াছিল, প্রায় সেইখান থেকেই রামলগনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'না, হামি তো এই জগতেই আছি বহুৎক্ষণ থেকে।'

লোকটা বউয়ের ঠিক উল্টো...বোকা, অলস, অপরিষ্কার। একটা কাঠের গুঁড়ি যেন, ঝি যেদিকে লইয়া চলে, গড়াইয়া গড়াইয়া যায়, ছাড়িয়া দিলেই নিশ্চল হইয়া পড়ে। যাকে গাড়োল বলা হয়, ঠিক

সেই ধরনের লোক।

ঝি ওর কথায় একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'কাজ আছে কোন দিদিমণি ?'

'না, তেমন কিছু নয়। বলছিলাম, তোরা দু'জনেই যে কোথায় থাকিস...'

ঝি চলিয়া গেলে শীলা স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, 'দেখলে তো! দুটোতেই ছিল, ও হারামজাদী বাঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে।...অন্যায় নয় ? কি করছি না করছি, এই রকম আড়াল থেকে দেখবে !'

পুলিন হাসিয়া বলিল, 'বসন্ত যদি অন্যায় না হয় তো এ-ও অন্যায় নয়। হাওয়াই আজ এইরকম যে শীলা। তখন ওরাঁও দু'টি থেকে আমরা কি চোখ ফেরাতে পেরেছিলাম—যখন ফুল গোঁজার সময় ছেলেটা খোঁজ নিচ্ছিল, কেউ কোথাও দেখছে কিনা ?...নাও, গাও দিকিন, লক্ষ্মীটি।'

শীলা তবুও চুপ করিয়া রহিল। আবার তাগাদায় ধীরে ধীরে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কি একটা যেন বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী একটু কৌতুকের সহিতই হাসিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি ?'

কুণ্ঠিত উত্তর হইল, 'না, আমায় মাফ কর, আমি গাইতে পারব না আজ।'

মুহূর্তমাত্র থামিয়া স্বামীর মুখের উপর লজ্জিত দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, 'একটা মজার ব্যাপার হয়েছে—অনেক দিন, অনে – ক দিন পর...'

আবার মুহূর্তখানেক থামিয়া স্বামীর বিমূঢ় দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, 'শুধু ঝি নয়, আজ তোমার সামনেও আমার কেমন বড্ড লজ্জা-লজ্জা করছে বাপু...আমি বলে ফেললাম মনের কথাটা, যাই মনে কর না কেন...কেন এমনটা হ'ল কে জানে...' বলিয়াই নিতান্ত ছেলে-

মানুষের মত খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শীলা নিজের লজ্জারুণ মুখটা দুই হাতের অঞ্জলিতে ঢাকিয়া ফেলিল।

একটু গেল। পুলিন কি একটা অতি নিবিড় নেশায় যেন আবিষ্ট হইয়া গেছে। বাহিরের ফাগে আর মনের ফাগে একাকার হইয়া গেছে যেন। একি বিপর্যয়! চার বছর পরে হঠাৎ ফুলশয্যার রাত কোথা থেকে আসিয়া পড়িল শীলার চেতনায়—লজ্জায়, কুণ্ঠায় তাহাকে আবার নববধূ করিয়া দিয়া? পুলিন জানালার বাহিরে চাহিয়া কি একটু ভাবিল। চোখ দুইটি তার কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরিয়া গিয়া সে আবার বধূকে বাম-করে বেষ্টন করিয়া কাঁধের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'শীলা!'

উত্তর হইল না। পুলিন বলিল, 'এ লজ্জার ওষুধ আমি জানি শীলা।'

শীলা মগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'কি?'

আবার সেই ঝিরঝিরে আতপ্ত হাওয়াটা একটু জাগিয়ে উঠিয়াছে; একটা মদির ভাব—যতরকম প্রগলভতায় মনটাকে যেন মাতাইয়া তোলে।

বধূর কপালে, কর্ণমূলে দুলিতেছে চূর্ণকুন্তল,—ফোটা ফুলের কেশরের মত। আস্তে আস্তে তুলিয়া দিতে দিতে পুলিন বলিল, 'ছোট লজ্জাকে সরাতে হলে খুব একটা বড় লজ্জার কাজ করতে হয়।'

শীলার মুখটা মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধ করপুটে একটু টান দিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, 'পারবে শীলা? অনেকদিনের একটা সাধ।'

শীলা অঞ্জলির উপর দিয়াই কুণ্ঠিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল, কিছু না বুঝিয়াই দুষ্টামির সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'পারতে হবে। আজ তুমি আমায় নতুনভাবে পেলে, তাই এই নতুন করে লজ্জা। আমিও তোমায় একটু নতুন করে পাব না কেন?

রাজি ?'

রাজি নয়, তবে কৌতূহলকে চাপিতে না পারিয়া শীলা হাতের অঞ্জলি আলগা করিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপারখানা কি বলতো ?' তার মুখটা আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিন লজ্জিত মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'সেই গাউনটা (gown), প্যারিস থেকে যেটা তোমার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম···এক মে-ডে'তে (May Day) কেনা ; সেটা ওখানকার দোলের দিন।··· এ তো আর আমাদের বাড়ি নয় যে লজ্জা···হ্যাঁ পর, লক্ষ্মীটি। তোমায় গাউন পরলে কেমন মানায় অনেক দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে আছে, আজ ঠিক যেন সেই দিনটি এসেছে।'

তাহার পর আবার কাঁধের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'ঝি আর চাকর ওদিকে আছে, আমরা দু'জনে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব। তারপর বেড়িয়ে এসে এই দিক দিয়েই আবার ঢুকে পড়ব বাড়িতে। সন্ধ্যেও হয়ে এল।'

শীলার চোখ দুটিও কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, টিপ্পনী করার মত করিয়া বলিল, 'এক্ষুণি জ্যোৎস্না উঠবে···ভরা জ্যোৎস্না।'

অর্থাৎ আজকের সন্ধ্যায় সুট, গাউন গোপন হইবার নয়।

ফল কিন্তু হইল উল্টো, বসন্তে এমনই হয়। পুলিন আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শীলার হাত দুইটা ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'ঠিক শীলা, আজ আবার ভরা জ্যোৎস্না, সামনেই তো পূর্ণিমা।···পর', আমার দিব্যি। জ্যোৎস্নায় যা খুলবে ওই গাউন! আর তোমার গায়ে····আমি যাচ্ছি বাইরে, এই চাবি রইল।···আজ কতদিন থেকে যে বাক্সয় ঘুরছে বেচারি!····আমরা এই দিক দিয়েই বেরিয়ে যাব, চোখে পড়বে না কারুর···'

শীলাও কেমন যেন হইয়া গেছে। বহুদিনের প্রতিজ্ঞা হঠাৎ আজ শিথিল হইয়া গেল কেন? একি সর্বনাশা সব-বিলুবার ভাব আজ আকাশে-বাতাসে! সে হাসিয়া বলিল, 'কি আদাড়ে শখ বাপু, যার জন্যে ঝি-চাকরের কাছেও চোর হওয়া!'

পুলিন বাহির হইতে দোরটা ভেজাইয়া দিতে-দিতে বলিল, 'মত বদলালে চলবে না, এসে দেখি যেন…'

শীলা হাসিয়া বলিল, 'প্যারিসের একটি মেমসাহেব বসে আছে ·' সে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরের কথা।

সন্ধ্যা কখন আসিয়া চলিয়া গেছে টের পাওয়া যায় নাই। একটু আবছায়া হইতে না হইতেই ত্রয়োদশীর চাঁদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে হইল, দিনের আলো রাতের জ্যোৎস্নায় যেন বিলীন হইয়া গেল।…আজ সব তাতেই কি রকম একটা গলাগলি, মাখামাখি কাণ্ড।…শুধু যে আলোয়-আলোয় তাই নয়,…হাওয়ায়, পাখীর সুরে, মহুয়ার গন্ধে, মনের বাসনায়, বাসনার তৃপ্তি-অতৃপ্তিতে সব একশা হইয়া গেছে।

শীলার পায়ে হীল্‌-তোলা জুতা, তাহার উপর হালকা গোলাপী রঙের স্কিনকলার মোজা, পরনে দুধের মত ধবধবে খুব দামী সিল্কের গাউন…একটু খাটো। তাতে বয়সে সত্যিই ওকে যেন সেই ফুলশয্যা রাতের শীলাটি করিয়া দিয়াছে। হাতে একটা সিল্কের নানারকম ফুল-বসানো চমৎকার মেয়েলি টুপি।

পুলিনের আগে থাকিতেই বেড়াইবার জন্য সান্ধ্য-সুট্‌ পরা ছিল। আর সুট্‌ই ওর আটপৌরে পোষাক।

কিন্তু বেড়াইতে যাওয়া হয় নাই। খোলা জানালার সামনে সোফাটা টানিয়া দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। বড় লজ্জা ছোট লজ্জাকে চাপা দিতে গিয়া নিজেই পায়ে-পায়ে জড়াইয়া গেছে। সব করিয়া ধরিয়া শীলা একেবারে শেষ দিকে আসিয়া হঠাৎ অবুঝের মত জিদ ধরিয়া বসিয়াছে। জুতা, মোজা, গাউন পরিয়াছে, হাতে সোনার ব্যাণ্ড দেওয়া রিস্ট-ওয়াচ বাঁধিয়াছে, পুলিনের আগ্রহে মুখে পাউডার

ক্রুজ্‌ পর্যন্ত বাদ দেয় নাই, ফোটাফুলের গন্ধের মত তাহাকে ঘেরিয়া ইভ্‌নিং-ইন-প্যারিসের পেলব গন্ধ গম্‌-গম্‌ করিতেছে, কিন্তু এর পরেই সে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়াছে, টুপি মাথায় দিবে না, আর বেড়াইতে যাইবে না।

স্বামী মিনতি করিতেছে, 'চল শীলা, বেড়িয়ে আসি। সব ঠিক্‌-ঠাক্‌ করে এ কি অদ্ভুত জিদ দেখ দেখি! কি দোষ এমন হবে টুপিটা পরলে আর বেড়িয়ে এলে?'

শীলা বলিল, 'হবে। কিন্তু কি দোষ এমন হবে টুপিটা না পরলে আর বেড়িয়ে না এলে?'

'সে তুমি বুঝলে আর ওকথা বলতে না। এ শুধু আমায় জ্বালানো তোমার।'

'তোমার শখের পায়ে লজ্জা-সরম সব জলাঞ্জলি দিই, সেটা মোটেই আমায় জ্বালানো নয় তো!'

পুলিন যেন নিরুপায়ভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বোধ হয় বধুর লজ্জা দূর করিবার একটা উপায় হিসাবেই বলিল, 'বেশ, তবে একটা গান গাও। সব তাতেই অবাধ্য হবে না নিশ্চয়?'

'বাপরে, তা পারি কখনো হতে!···গুরুজন!'

সে একঝলক হাসিয়া সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হইয়া বলিল, 'কিন্তু আমি প্যারিসের গান জানি না তো। এই গাউন পরে···'

'তুমি বাংলা গানই গাও।'

'ওমা! সে যে কাঁটা-চামচ নিয়ে আলুভাতে খাওয়ার মত হবে!' বলিয়া একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবার পুলিনের পালা। অভিমানভরে একটু ঘুরিয়া বসিল, বলিল, 'থাক্‌, বোঝা গেল, যখন খুব বেশি পেতে চাই তোমায়, তখনই বেশি করে দগ্ধাও তুমি আমাকে, শীলা। আজ নয়, এই চার বছর থেকে দেখে আসছি এই তোমার রীত। থাক্‌, আমার ঘাট হয়েছে।' সে আরও একটু ভাল করিয়া ঘুরিয়া বসিল।

অনেকক্ষণ গেল, তাহার পর শীলা স্বামীর পিঠের উপর আস্তে

আস্তে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বাহুতে গালটা চাপিয়া মৃদু স্বরে বলিল, 'রাগ করলে ?'

কোন উত্তর হইল না। শীলা আবার বলিল, 'অমনি রাগ হ'ল বাবুর। আচ্ছা চল, বেড়িয়ে আসি।....চল না।'

'না থাক্, কেউ দেখে ফেলবে তোমায় শেষে, সে লজ্জা আবার আমি কি করে সামলাব বল ?'

শীলা গালটা স্বামীর বাহুতে আরও চাপিয়া বলিল, 'এখনও রাগ গেল না বাবুর, বাবাঃ।'

একটু থামিয়া বলিল, 'আচ্ছা, একটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, তাই কোরো, তাহলে আমার একেবারেই লজ্জার কারণ থাকবে না কোন।'

নূতন ধরনের কথা শুনিয়া স্বামী প্রশ্ন করিল, 'কি উপায়টা শুনি ?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে তো বোলো, শীলা তো মরে গেছে। ও আমার প্যারিসের এক বান্ধবী এসেছিল, তাকেই নিয়ে আমি···'

স্বরটা হঠাৎ গাঢ় হইয়া আসিল।···ভরা বসন্তেও কখন হঠাৎ একটু মেঘ করিয়া আসে, দু'ফোঁটা বৃষ্টি হয়।····কোথা দিয়া যে মেঘ আসে ঠিক বোঝা যায় না।

পুলিন নিজের দক্ষিণ বাহুর উপর বাঁ হাতটা বুলাইয়া দেখিল, সেটা ভিজা।···বড় ভুল হইয়া গিয়াছে ; আজকের মত চমৎকার দিনে কেমন করিয়া এ ভুল করিল সে ?···কিন্তু বড় দেরিও হইয়া গিয়াছে যে। পুলিন অন্তরে-অন্তরে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল—বসন্তের এই দুর্লভ কয়টি মুহূর্ত—শীলার মন থেকে এই অশ্রুরেখাটুকু কি কোন মতেই মুছিয়া ফেলা যায় না ?

কিন্তু বসন্তেরই মেঘ তো ? সে আয়ু লইয়া আসে না। হাল্কা বৃষ্টির পর স্বচ্ছ আকাশে আলো আরও বেশি করিয়া ঝলমলিয়া ওঠে।

শীলা মুখটা একবার ঘুরাইয়া স্বামীর অলক্ষেতে চোখ দুইটি মুছিয়া লইল, তাহার পর আবার স্বামীর গায়ে লতাইয়া পড়িল, বলিল, 'এ আবার কি ভাব !'

পুলিন ফিরিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, 'তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি শীলা।'

তাচ্ছিল্যের সহিত ভ্রূ নাচাইয়া শীলা বলিল, 'ও, এই কথা। তা, স্বামী-দেবতারা আর কি করতে আছেন শুনি?'

সঙ্গে সঙ্গেই হাসিয়া ফেলিল। পুলিনের অনুতাপের ভাবটা কিন্তু কাটিল না, বধূর পানে ঘুরিয়া মিনতির স্বরে বলিল, 'না, সত্যিই আমায় মাফ কর শীলা, আর গাউনটাও তুমি ছেড়ে ফেল।'

'না, এটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'তবু ছেড়ে ফেল।'

'কেন, তুমি পরবে নাকি?

দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। শীলা বলিল, 'আশ্চর্য নয়, আজ যেমন উদ্ভট শখ সব মাথায় ঢুকেছে।'

পুলিন বলিল, 'সত্যি, কি যে চাই ঠিক বুঝতে পারছি না শীলা, খুব বেশী করে পেতে গিয়ে চারিদিকে যেন ঠোক্কর খেয়ে মরছি।'

জ্যোৎস্না আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'চোখ গেল'! 'চোখ গেল'!! 'চো—খ গেল'!!! করিয়া একটা পাপিয়া আকাশ-বাতাস উচ্ছকিত করিয়া তুলিয়াছে। চোখ ঝলসানো রূপই বটে আজকের রাতের!

বারান্দার দিকে দরজাটা কে যেন খুব সন্তর্পণে অল্প একটু ফাঁক করিতে চেষ্টা করিতেছে। পুলিন প্রশ্ন করিল, 'কে?'

শীলা স্বামীর কাঁধে মাথাটি চাপিয়া কোথায় যেন ডুবিয়া তলাইয়া গেছে। কে দেখিল, না দেখিল তার হদিস নাই। স্বামীর প্রশ্নেও সাড় হইল না।

একটু পরে খুব ধীরে ধীরে, যেন কোন স্বপ্ন-লোক হইতে প্রশ্ন করিল, 'একটা কথা বলি!'

'বল'

'চল, বেড়িয়ে আসি।'

স্বামী বধূর মাথাটি নিজের কাঁধে একটু চাপিয়া ধরিল, বলিল, 'এ তো আমারই কথা শীলা।'

'তোমারই শীলা অন্তের কথা সে কোথায় পাবে?...আমি গাউনটাও ছাড়ি।'

'খুব লক্ষ্মী হয়ে উঠেছ শীলা তুমি। হ্যাঁ, ছেড়ে ফেল।'

'আর তুমি ঐ সুট্‌টা ছাড়।'

পুলিন অতিমাত্র বিস্ময়ে ঘাড়টি একেবারে ফিরাইয়া স্ত্রীর পানে চাহিল,—সত্যই কোটপ্যান্ট ছাড়িতে বলে, না, মস্‌করা?...বিদ্রূপের কোন চিহ্নই কোথাও নাই দেখিয়া একটু কিন্তু হইয়া বলিল, 'আমার সুট্‌টা থাক্ না, কি আর ক্ষতি করছে ও? কাপড়ে একটা কি রকম অস্বস্তি হয়, ক্রমান্বয়ে চার বছর ওদেশে থেকে কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে....'

'তবু কাপড়ই পর। কাপড়, পাঞ্জাবি আর চাদর।'

'শীলা, লক্ষ্মীটি, দোহাই। অবশ্য স্বীকার করছি একটা বদ অভ্যেস কিন্তু সুট্‌টা ছাড়লে যেন মনে হয়...'

'তা হোক, কাপড়ই পরতে হবে, অন্তত আজকের রাত্তিরে। আমি বের করে দিই।'

'নাঃ, তুমি ভয়ানক অবাধ্য হয়েছ শীলা। এরকম ছুটি দেখা যায় না।'

দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিবে, নাকের উপর ধাক্কা লাগিয়া রামলগন পড়িতে পড়িতে কোনরকমে সামলাইয়া লইল। সামনের থামে হেলিয়া, নাকের উপর হাত দিয়া, পুলিনের মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পুলিন বিস্ময়ে রাগে মুখ গম্ভীর করিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুই এখানে কি করছিলি রে?'

রামলগনের মুখটা বোবার মত হাঁ হইয়া গেল, কোন উত্তর বাহির হইল না।

ঝি বারান্দার ও-কোণ থেকে আগাইয়া আসিল, যেন ওই দিকেই

এতক্ষণ ছিল সে। পারতপক্ষে সে প্রভুর সঙ্গে কথা কয় না। কাছাকাছি আসিয়া ঘরের মধ্যে শীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'ওকে জিগ্যেস করতে পাঠিয়েছিলাম দিদিমণি, বাবুর খাবার দেওয়া হবে? সদানন্দ জিগ্যেস করছিল...'

বানানো কথা, কিন্তু সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও ঝিয়ের কথাতেই সায় দিত। আর কথা না বাড়াইয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেল। কিছু দূরে একজন পরিচিত চেঞ্জারের নাম করিয়া বলিয়া গেল, তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

বসন্তের নৈশবিহার চলিয়াছে, এক মুহূর্তেই এরা যেন কোথা থেকে কোথায় আসিয়া গেল। জানালার মধ্য দিয়া সে হাওয়া আর চাঁদনি অল্প-অল্প করিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদের দুজনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কাছেপিঠে কোথায় একটা নেবু গাছে ফুল ধরিয়াছে, মিষ্ট গন্ধে বাতাসটা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় উঁচুনিচু জমির উপর আলোছায়ার মায়া বিছানো। বহুদূরে ওরাঁও-পল্লী থেকে বাঁশীর মেঠো সুর ভাসিয়া আসিতেছে, কেমন যেন মনে হইতেছে...সেই ছেলেটার বাঁশী; বিরামহীন চলার পথে তাহারা দুটিতে অফুরন্ত সুরের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—মনে হইতেছে, এই সুরটুকুই শুধু জাগ্রত, আর সব চরাচরই এর যাদুস্পর্শে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সামনেই জমিটা খানিকটা গড়াইয়া গিয়াছে। শীলা অযথাই হাসিতে হাসিতে একটা কলোচ্ছ্বসিত পাহাড়ী ঝরণার মত তরতর করিয়া নামিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া বলিল, 'ওমা, তুমি এখনও ওপরে দাঁড়িয়ে! কি কুঁড়ে মনিষ্যি বাপু! নেমে এসো; এসো না গো!'

পুলিন বলিল, 'তুমি একটু থামো। একটা জিনিস নিয়ে আসি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল।'

'কি ?'

'শোন বলি।'

'ঐখান থেকে বলা যায় না ?'

'কাছে এসে শুনলে দোষ আছে ? খেয়ে ফেলব আমি ?'

'তা পারো, আজ তোমায় বিশ্বাস নেই।'

শীলা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পুলিনও মৃদু হাস্যের সহিত যোগ দিল, নামিতে নামিতে বলিল, 'আচ্ছা, আমিই নেমে বলছি, গরজ একলা আমারই নিশ্চয়। বলছিলাম, তোমার হঠাৎ ফুলশয্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, না ? আজ তারই ব্যবস্থা করতে হবে— এবারে ঐ পাহাড়ী নদীর বালুচরে। তাই…'

শীলা কপট বিস্ময়ে ভ্রূ কপালে তুলিয়া বলিল, 'তাই বুঝি বাড়ি থেকে ঐ বীরভদ্দর পালংটা মাথায় করে নিয়ে আসতে যাচ্ছ ?' বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল।

পুলিন বলিল, 'আঃ, জ্বালিও না শীলা। তুমিও চল, কোঁচড় ভরে ফুল নিয়ে আসতে হবে বাগান থেকে।'

'বলিহারি শখ' বলিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে শীলা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

স্বামীর পানে লজ্জিত হাস্যের সঙ্গে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'বলব ?'

পুলিন সকৌতুকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'আবার কি ?'

'ও ফুল চাই না।'

'তবে ?'

শীলা সেইভাবেই চাহিয়া হাসিতে লাগিল। একটু পরে বলিল, 'হাসতে পাবে না বাপু, তা বলে রাখছি।'

'আজ তোমার কাণ্ড দেখে হাসি আর আসছে না আমার।'

শীলা হঠাৎ ফিরিয়া পা বাড়াইল, বলিল, 'এসো, ফেরো।'

পুলিন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'ফেরো মানে। আনবে না ফুল ?'

শীলা লজ্জার ভয়ে স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল না। আব্দারের

ভঙ্গিতে গলাটা দুলাইয়া সামনে চাহিয়াই বলিল, 'বাগানের ফুলে হবে না আজ, আমার সেই পলাশ ফুল চাই…সেই ছেলে আর মেয়েটা যার তলায়…'

শেষ না করিয়া একবার মুখটা ঘুরাইয়া বলিল, 'কই এসো ? বাঃ !'

ফিরিতে একটু বিলম্ব হইল।

সদানন্দ বারান্দার সিঁড়িতে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, দূর থেকে এদের দেখিয়া হন্তদন্ত হইয়া আগাইয়া আসিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া দুইজনেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, 'কি ব্যাপার সদানন্দ ?'

সদানন্দ পাচক ব্রাহ্মণ, বাঁকুড়ার ওদিকে কোথায় বাড়ি। বলিল, 'সর্ব্বনাশটি হোল বটেক্ বাবুমশয়। আপনকার ঘরে সাহেব আর মেম দেখি।'

'আমার ঘরে সাহেব আর মেম। তোমরা কোথায় ছিলে ? রামলগন আর ঝি কোথায় ?'

সদানন্দ হাত উল্টাইয়া বলিল, 'উ দুটিতে তো পলায়ে গেল বটেক্। আমি পাক করে একটু বাইরে যাওয়া করেছিলাম, এসে দেখি আপনকার ঘরে আর দু'জন, রামলগনটির আর ঝিটির দেখ্যা নাই বটেক্।'

স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। শীলা বলিল, 'মিশনের সেই পাদ্রী সাহেব আসেনি তো ?…কিন্তু ওরা দু'জনে কোথায় গেল ? পালাবার কি আছে ?'

সদানন্দের কাছে টের পাওয়া গেল, তারা দু'জনে নিশ্চয়ই ভয়ে পলাইয়াছে। কেননা, সাহেব-মেম] দু'জনেই পাগল, ঘরে আলো নিভাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে সদানন্দের পাশের গ্রামের একটি মেয়েছেলে রাঁধুনীগিরি করে। বাবুর আসিতে দেরি হইবে জানিয়া তার সঙ্গে সদানন্দ দেখা করিতে গিয়াছিল। বাড়ি যাইতেছে, কোন যদি তত্ত্বতাবাস থাকে। ফিরিয়া দেখে এই কাণ্ড! সাহেব-মেম অবশ্য এখন খুব ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সদানন্দের অবর্তমানে গুরুতর রকমের হইচই বা একটা কিছু করিয়াছিল, তাহা না হইলে উহারা দু'জনে পলাইবেই বা কেন?

শীলা স্বামীর পাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি হবে গো? আমার পাগলকে বড্ড ভয় করে। হ্যাঁগা, সায়েবরা আবার পাগল হতে আরম্ভ করলো কবে থেকে? বেশ তো ছিল…'

সদানন্দ 'গান্ধী মহারাজ যবে থেকে…' বলিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল। পুলিন তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি দেখেছ ওরা কোথাও আছে কিনা? পাশের বাড়িগুলোতে দেখেছ?'

সদানন্দ জানাইল, সে বাড়ি ছাড়িয়া নড়িবে কি করিয়া? তবে সব ঘর পা টিপিয়া-টিপিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, ওদের দু'জনের কেহ নাই।

প্রশ্ন হইল, 'সাহেবকে জিগ্যেস করতে পারতে তো? কোথা থেকে এসেছে, কেন…'

সদানন্দ হাত দুইটা একটু তুলিয়া এমনভাবে শিহরিয়া উঠিল যেন পুলিনকেও একজন পাগল ঠাহর করিয়াছে। একট কথায় তাহার সমস্ত ভয় ও বিস্ময় জড় করিয়া বলিল, 'বাবুমশয়!'

পুলিন বিরক্তভাবে বলিল, 'চল দেখি। হতেও পারে পাগল। বাবুরা সব টহল দিতে গেছেন, সুবিধে বুঝে ঢুকে ব'সে আছে। আজকাল আবার নেশা করে নানারকম সং সেজেও তো প্রায় আধা-পাগল হয়ে রয়েছে সব দোলের হিড়িকে। ঢুকে পড়েছে তাদের মধ্যে কেউ।

আমার কথা ধরে রাখো—এদের আসবার আগেই সে হারামজাদী ঐ ইডিয়টটাকে নিয়ে জ্যোচ্ছনায় হাওয়া খেতে গেছে—মনিবদের নকল করা চাইতো!...শখ করে একটু যে...মানে, নেহাত জরুরী কাজেও লোকে যে একদণ্ড এদের হাতে বাড়ি ছেড়ে যাবে...'

শীলা বলিল, 'হ্যাগা, সত্যি পাগল হতেও পারে যে বলছ—দু'জনেই পাগল হবে? কি পাগলা হাওয়া উঠেছে বাপু!'

পুলিনের মেজাজটা খিঁচড়াইয়া গিয়াছে, বিরক্তভাবেই বলিল, 'না হলে একজন আলো নিবোলে, আর একজন জেলে দিতে পারত না!...কী যে ছেলেমানুষের মতো বকো। তুমি যেন আরও মাথা গুলিয়ে দিচ্ছ...চল, দেখি। তুমি না হয় দাঁড়াও এখানটায়।'

'না, একলা আমার ভয় করবে। একি বেয়াক্কেলে পাগল হলতো—ঘরে ঢুকে বসে থাকা, যাদের ঘর তারা বাইরে হাঁ করে থাকুক।... ওগো, আস্তে... অত গোঁয়ার্তুমি নয়। এখন আবার ওরা কি করছে, কে জানে? হাতে যদি একটা কিছু নিয়েই বসে থাকে।... না বাপু, এ বীরপুরুষকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

তিন

ইহারা বারান্দায় উঠিল। শীলা একটু পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল, পা চালাইয়া স্বামীর পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক কথাই, উঠানের ওদিকে তাহাদের ঘরে আলো নিভানো, জানালার সামনে সোফাটায় একরাশি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। মুখ দেখা না গেলেও স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সোফার উপর একজন সাহেব আর একজন মেম, দুইজনেই ওদিকে মুখ করিয়া। সাহেব সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া আছে, হাতে একটা পাইপ। টানিবার আর ধোঁয়া ছাড়িবার বহর দেখিয়া আর সন্দেহ থাকে না যে, জবরদস্ত পাগল। থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা সাহেবী গলাখাঁকারি দিয়া উঠিতেছে। মেমসাহেব তাহার একটা উরুকে বালিশ করিয়া জানালার পানে চাহিয়া উল বুনিতেছে। একবার উঠিল, মনে হইল যেন সাহেবের হেলান-দেওয়ার ভঙ্গিটা ঠিক

করিয়া দিল, তাহার পর আবার বেশ জুত করিয়া তাহার জানুতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল।

শীলা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, 'কিছু বুঝতে পারছ?'

স্বামীর পিঠে হাত দিয়া আরও সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হ্যাগা, ভূত নয় তো? লোক ডাকবে?'

তিনজনেই চমকাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার লজ্জিত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা কিছুই নয়, সাহেব আর মেমসাহেব হঠাৎ গলাখাঁকারি দিয়াছে। পরক্ষণেই যেন মনে হইল, গুনগুন করিয়া গান আরম্ভ হইল। ঘরটা উঠানের ওধারে, মেমসাহেবী গলার আওয়াজ খুব মিহি হইয়া আসিতেছে।

এরা তিনজনে একেবারে কাঠের পুতুল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরে ঢুকিয়া আলো নিভাইয়া গান গায়—এ-পাগলামির অভিনবত্ব আছে। গুনগুনানি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহার পর স্পষ্ট গান··· শীলার বিস্ময়ের অন্ত নাই। স্বামীর জামার হাতাটা চাপিয়া ধরিয়া কি বলিতে যাইবে, এমন সময় সাহেব পর্যন্ত মুখ থেকে পাইপ সরাইয়া সরাসরি গান করিয়া উঠিল। গুনগুনানির দিক দিয়াও নয়। দোলের দিন ছাপরেয়ে বা ভোজপুরীদের কণ্ঠে যেমন শোনা যায়,···সেই গান, সেই সুর, সেই ভঙ্গি···

'ওহো, ফাগুনাকে রাতিয়ামে পিয়া
কাঁহ্ মা হো—
ফাগুনাকে রাতিয়ামে পিয়াবা—আ—আ—আঃ···'



একা

জরাসন্ধ

সকলেই মনে করেছিল, আজকে অন্ততঃ 'কত্তার' রোজকার রুটিন কিছুটা বদলাবে। নাতনীর বিয়ে। অত আদরের নাতনী। নটা পনেরতে লগ্ন। কিছুক্ষণের জন্যেও একবার আসরে এসে বসবেন বৈকি।

কাঁটায়-কাঁটায় নটা বাজতে তিন। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় শেষ নজর বুলিয়ে ভাঁজ করে রাখলেন টেবিলের উপর। চশমাটা খুলতে খুলতে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, 'সত্যেন…'

সত্যেন ওঁর নাতি, মেজো ছেলের সেজো ছেলে। অন্য দিন পাশের ঘরেই মোতায়েন থাকে। আজ বিয়ের ব্যাপারে কোথায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে এসে যখন পৌঁছল, ঘড়িতে নটা বেজে দুই। মৃত্যুঞ্জয় তখন বিছানায় উঠে গেছেন। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'

সত্যেন জবাব দিল না। দিলে আরো চটে যাবেন দাদু, ঘুমের ব্যাঘাত হবে। নীরবে মশারী ফেলে চারধারটা গুঁজে দিয়ে আলো নিবিয়ে চলে গেল।

ঠিক নটায় এটা তার প্রাত্যহিক কাজ। 'কত্তা' বেঁধে দিয়েছেন। এত লোক রয়েছে বাড়িতে—স্ত্রী, মেয়েরা, বৌমারা, নাতনীরা, চাকর-বাকর…কারো মশারী-গোঁজা ওঁর পছন্দ নয়। কোন্

দিকটা কুঁচকে কিংবা ঝুলে থাকে, কোথাও হয়ত একটু ফাঁক থেকে যায়। পাছে মশা ঢোকে, এই ভাবনায় সারারাত ঘুম হয় না। শরীর খারাপ করে।

সত্যেন কলেজে পড়ে। বয়স আঠার-উনিশ। ইংরেজি ছবির ভীষণ ভক্ত। কিন্তু স্টেটসম্যানের রিপোর্ট পড়েই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। চাক্ষুষ দেখবার উপায় নেই। কখন দেখবে? সন্ধ্যার শো'তে গেলে চৌরঙ্গী পাড়া থেকে শ্যামবাজার নটার মধ্যে ফেরা যায় না। নাইট শোতেও নটার আগে বেরোতে হয়। দুপুর বেলা কলেজ পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া এ বাড়ির কাছে মারাত্মক অপরাধ।

একবার একটা কী দুর্দান্ত ছবি এসেছে লাইটহাউস-এ। কী করে দেখা যায়? কত্তার খাস চাকর রাম ভরসা দিল, 'যাও না, একটা দিন আমি চালিয়ে নেবো।'

'পারবি তো?'

'পারবো। আমি তো দেখেছি তুমি কেমন করে গোঁজো।'

'তোকে যদি চিনে ফেলেন?'

'তোমার জামাটা গায়ে পরে নেবো।'

পঁচাশি পেরোলে কি হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের শ্যেন-চক্ষুকে ফাঁকি দেয় কার সাধ্য? ঠিক ধরে ফেললেন, 'তোকে কে আসতে বলল? সে হতভাগাটা কোথায়?'

রাম নীরব। হুকুম হল, 'তাকে ডেকে দে।' রাম ডেকে আনল মেজো বৌমাকে। তিনি দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে, অর্থাৎ ছেলেকে তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর বাপের বাড়ি, অসুস্থ বাপকে দেখতে···ইত্যাদি কাহিনী দিয়ে শ্বশুরকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলেন। মৃত্যুঞ্জয় আর কিছু বললেন না। কিন্তু রাত্রে ঘুম হল না। সকালে ডাক্তার ডাকতে হল। ব্লাডপ্রেসার বেশ কয়েক ধাপ বেড়ে গেছে।

বিয়ের পরদিন সকালেও চিরাচরিত নিয়মের এতটুকু হেরফের হল না। ঠিক সাড়ে সাতটায় বড় বৌমা এলেন শ্বশুরের প্রাতরাশ নিয়ে। মাপা গেলাসে এক গেলাস ছাগলের দুধ, তার সঙ্গে একখানা থিন অ্যারারুট বিস্কুট। এ কাজটি বড় বৌমার। তাঁরই মেয়ের বিয়ে, ওদিকে একরাশ কাজ পড়ে আছে। তবু আসতে হল। অন্য কারো হাতে পাঠালে শ্বশুর ক্ষুণ্ণ হবেন। খাবেন হয়তো, কিন্তু খাবারটা ঠিকমত হজম হবে না।

জলযোগ শেষ করে খবরের কাগজটা টেনে নিতে যাবেন, বড় বৌমা বললেন, 'এবার ওদের নিয়ে আসব বাবা?'

মৃত্যুঞ্জয় বুঝলেন, বর-কনের কথা বলছেন পুত্রবধূ। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না। বোধ হয় ভাবতে লাগলেন, তাঁর বাঁধা রুটিনের কোন্ দফাটাকে সরিয়ে তাদের জায়গা করা যায়। বৌমা কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'সকলের আগে আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে তো অন্য কিছুই হতে পারে না বাবা।'

'আচ্ছা, নিয়ে এসো।'

বর-কনের সঙ্গে এল গোটা পরিবার। কিন্তু তার আকার এত বৃহৎ যে সামান্য অংশই ঘরে ঢুকতে পারল। জায়গার অভাব। বাকি অংশটা ছড়িয়ে রইল বারান্দায়।

প্রণামের পালা শেষ হলে নাতজামাইকে বসতে বললেন, দেয়ালের ধারে যে নিচু তক্তপোষটা পাতা আছে, তার উপর। নাতনী এসে দাঁড়াল দাদুর পাশ ঘেঁষে। তার দিকে চেয়ে ধমকে উঠলেন, 'এখানে কেন? ওখানে গিয়ে বোস। আই হ্যাভ অলরেডি মেড্ ওভার চার্জ। গত রাত থেকেই এ বুড়ো বাতিল হয়ে গেছে।'

অন্য সময় হলে নাতনী একটা যুৎসই জবাব দিত। এখন বোধ হয় এত লোকের সামনে লজ্জা হল। নিচু হয়ে দু-হাতে দাদুর গলা

জড়িয়ে ধরে নীরব প্রতিবাদ জানাল। মৃত্যুঞ্জয় হাসিমুখে দুটো আঙুল দিয়ে তার গালে মৃদু আঘাত করে বললেন, 'দেখা যাবে এবার কত টান থাকে দাদুর ওপর।'

গৃহিণী ছিলেন সামনে। বললেন, 'নাতনীকেই তো শুধু আদর করছ, নাতজামাইকে আশীর্বাদ করলে না?'

'ও, হ্যাঁ!' বলতে বলতে নাতজামাইএর দিকে ফিরলেন, 'আমার বয়স কত জানো? সাতাশি বছর সাত মাস। আশীর্বাদ করি, তুমি যেন তার ওপরে আরো তের বছর যোগ করতে পার। অ্যাণ্ড...।' চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাভ এ বিগার ফ্যামিলি দ্যান মাইন।'

একটা চাপা হাসি খেলে গেল সকলের মুখে। নতুন জামাই লজ্জায় মুখ নামাল। নাতনী একটি ছোট্ট চিমটি কাটল দাদুর কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিলেন মৃত্যুঞ্জয়, 'পারবি, পারবি। তোর ঠাকুমাকে দেখছিস না?'

ঘড়ির দিকে তাকালেন মৃত্যুঞ্জয়। ইঙ্গিতটা বুঝতে কারো অসুবিধে হল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। নতুন জামাইটিও উঠতে যাচ্ছিল। তিনি বাধা দিলেন, 'বসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।....এই যে তোমাকে বললাম, একশো বছর বেঁচে থাকো, তুমি ভাবছ, ওটা একটা কথার কথা, অনেকেই বলে থাকে। আসলে কিন্তু তা নয়। একশো বছর বেঁচে থাকা এমন কিছু কঠিন নয়, ইফ্ ইউ ওনলি নো দি আর্ট অব্ লিভিং। মুখে যে যা-ই বলুক, দীর্ঘজীবন পেতে চায় সকলেই, কিন্তু কী করে পেতে হয় সে রাস্তাটা খুব কম লোকেরই জানা আছে।'

দেয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে আটটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন মেজো বৌমা। এক হাতে নিক্তি, আরেক হাতে একটা ঝুড়ি। পিছনে চাকরের হাতে ট্রেতে বসানো কতকগুলো ছোটো বাটী। জামাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল। মৃত্যুঞ্জয় বললেন, 'অনেক দিন বেঁচে থাকবার প্রথম সিক্রেট কী জানো? এখনি

দেখতে পাবে।'

মেজো বৌমা তাঁর কাজ শুরু করলেন। দু-তোলা চাল ওজন করে রাখলেন একটা বাটীতে। তার সঙ্গে এক তোলা কাঁচা মুগডাল। আর একটিতে রাখলেন কিছু তরকারী—একটি ঢ্যাড়শ, দুগাছা বরবটি, কয়েকখণ্ড মোচা, দুটি ডুমুর, একটুকরো আপেল, সব মিলিয়ে চারতোলা। আরো কি সব টুকিটাকি, সবই গুনে কিংবা ওজন করে রাখা হল অন্যান্য বাটীগুলোয়। উনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সব। তারপর মেজো বৌমা চলে গেলেন। পিছনে ট্রে হাতে চাকরটি।

মৃত্যুঞ্জয় ফিরলেন নাতজামাই-এর দিকে, 'ঐ হচ্ছে আমার এ বেলার খাবার। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন্‌টার কী ফুড্‌ভ্যালু, কীসে কতটা ক্যালরি, সব কষে, হিসাব করে মেনুটা তৈরী করতে হয়েছে। কোন্‌টা কতক্ষণ সেদ্ধ হবে, কী রকম আঁচে, কেয়ারফুলি ওয়াচ করতে হবে, মেজো বৌমা সব জানেন। উনিই করে আসছেন বরাবর।'

হেলানো চেয়ারে এতক্ষণ বেশ সোজা হয়ে বসে মৃত্যুঞ্জয় কথা বলছিলেন। এবার পিছনের দিকে হেলান দিয়ে পা দুটো একটু ছড়িয়ে বসে বললেন, 'এসব কাণ্ড দেখে তুমি বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গেছ?'

'না, না, অবাক হবো কেন? এসব তো বেশ ভালো।'

'তুমি বলছ ভালো। আর আমার গিন্নী কি বলে জানো? এসব নাকি আমার বুড়ো বয়সের বাতিক। ছেলেমেয়ে বৌমারাও বোধ হয় তাই মনে করে। কিন্তু ওরা জানে না, না খেয়ে যত লোক মরে, তার চেয়ে বেশী মরে খেয়ে। খাবার আগে তোমাকে জানতে হবে কোন্ জিনিষটা তোমার উপকারী, আর কোন্‌টা উপযোগী।

তার চেয়েও বড় কথা, কোন্ জিনিষের কতটা তোমার সিস্টেম নিতে পারে। সংসারে এসেছি বেঁচে থাকতে। একটু হিসেব করে চললে যদি দশটা বছর বেশী টিকে যাওয়া যায়, মন্দ কী ?' সরকার তো আর তার জন্যে পেনসন্ বন্ধ করে দেবে না ?'

নাতজামাই মুখে বলল, 'সে তো বটেই।' মনে মনে বলল, 'পেনসনওয়ালা বৃদ্ধের দল সবাই যদি এমনি করে নিক্তি মেপে খেতে শুরু করে এবং পণ করে বসে, একশ বছর না পেরোলে নড়বে না সরকার নিশ্চয়ই আইন করে একটা বয়স বেঁধে দেবে, যার বেশী বাঁচলে আর পেনসন দেওয়া হবে না।'

জামাই বেচারা অনেকক্ষণ থেকেই পালাবার ফাঁক খুঁজছিল। দাদাশ্বশুরের বক্তৃতায় ছেদ পড়তে যেমন উঠতে যাবে, তিনি আবার শুরু করলেন, 'খাওয়া হল একটা দিক। আরেকটা ইকোয়্যালি ইম্পর্ট্যান্ট দিক হল রেগুলারিটি, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে ঠিকমত করা। সেদিকেও আমার কড়া নজর আছে। একেবারে ঘড়ি ধরে...'

নাপিত এসে ঢুকল দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে। তার সময় হয়ে গেছে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে একদিনের মাইনে কাটা যাবে।

বেঁচে গেল নাতজামাই।

৫

রিটায়ার করবার পর ছেলেরা বলেছিল, 'পেনসন্ তো ব্যাঙ্কের মারফত নেওয়া যেতে পারে, কি দরকার মাসে-মাসে ট্রেজারীতে ধরনা দেবার ? মৃত্যুঞ্জয়বাবু রাজি হননি। মাসে শুধু ঐ একটি দিন সতীর্থ, সহকর্মী এবং দু-চারজন সমকালীন বন্ধুদের দেখা মেলে, সে-সব দিনের সুখ-দুঃখের আদানপ্রদান করতে গিয়ে

ফেলে আসা পুরনো জীবনটা নতুন স্বাদ নিয়ে দেখা দেয়। তার ভিতরেও খানিকটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে। ঐ কয়েকটা ঘন্টা বেশ কিছুদিনের পরমায়ু বাড়িয়ে দেয়। সে লোভ ত্যাগ করা যায় না।

পঁচাত্তর পেরোবার পর সকলের চাপে পড়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন। তখনো বছরে একবার, এপ্রিল মাসে ট্রেজারী অফিসারের কাছে হাজিরা দেবার নিয়ম। সশরীরে জানাতে হয় আমি বেঁচে আছি। দু-একবার গিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। পরে লাইফ-সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা হল। সেজো ছেলে গেজেটেড অফিসার। সেই দেয় সার্টিফিকেট—মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ইজ অ্যালাইভ দিস ডে। এটা তাঁরই সই।

নব্বই বছরে পা দিয়ে হঠাৎ একদিন খেয়াল চাপল ওঁর। এপ্রিলে নিজেই যাবেন ট্রেজারীতে। কারো মানা শুনলেন না। বাড়ির গাড়ি করে বড় ছেলের মেজো ছেলে (সে ডাক্তার) এবং খাসভৃত্য রাম গেল সঙ্গে।

অনেক দিন পরে বাইরে বেরিয়ে চিরপরিচিত রাস্তাঘাট আর বাড়িঘরগুলোকে যেন নতুন রূপে দেখলেন। কচি পাতায় ভরে গেছে গাছপালা। বসন্তের চঞ্চল হাওয়ায় নব-জীবনের স্পর্শ। নিজের অন্তরের মধ্যেও একটা সজীবত্বের জাগরণ টের পেলেন মৃত্যুঞ্জয়। পৃথিবী বড় সুন্দর, বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ আছে।

ট্রেজারী অফিসার খাতির করে বসালেন। এরকম বর্ষীয়ান

পেনসনার তাঁর চাকরিজীবনে আর একটিও দেখেননি। মৃত্যুঞ্জয় তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের খোঁজখবর নিলেন। ট্রেজারী অফিসার কাউকে চিনতে পারলেন না। বললেন, 'আমি তো বেশী দিন আসিনি। আমার অ্যাকাউন্টান্টকে ডাকছি। তিনি অনেক দিন আছেন, হয়তো বলতে পারবেন।'

অ্যাকাউন্টান্টও বেশির ভাগ নাম শোনেননি। দু-চারটি মনে পড়ল, 'কাশীশ্বর রায়? তিনি তো অনেক দিন হল মারা গেছেন। বিশ্বনাথ হালদার? তিনিও নেই। মহিমারঞ্জন ঘোষালও মারা গেছেন গেল বছর।'

এমন একজনকেও পাওয়া গেল না, যিনি বেঁচে আছেন।

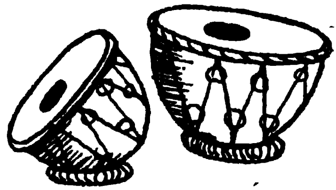
বাড়ি ফেরার পথে ঐ একটা কথাই জেগে রইল মৃত্যুঞ্জয়ের মনের মধ্যে, সবাই চলে গেছে, পড়ে আছেন তিনি একা।

ঠিক পাঁচটায় রোজকার মত ছানা আর ফল নিয়ে এলেন সেজো বৌমা। অন্য দিন মৃত্যুঞ্জয় হাত বাড়িয়ে ডিসটা টেনে নেন। আজ হাত নেড়ে বিরক্তির সুরে বললেন, 'নিয়ে যাও।'

'খাবেন না?'

'না।' বলে, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

শ্বশুরের চোখ-মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেলেন সেজো বৌমা। জরা ও ক্লান্তির চিহ্নগুলো হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার উপরে কীসের একটা ছায়া।



ঘুম কাতুরে

আশাপূর্ণা দেবী

দেওয়ালের বড় ঘড়িটা যতগুলা ঘণ্টা বাজাইবার ছিল, সব বাজাইয়া শেষ করিয়া, আবার একবার রাত্রির গভীরতা' সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়, বারোটার পর কাঁটা একের দিকে দৌড়ায়।

এত রাত্রে ফুলশয্যা!

অন্তঃপুর হইতে বরের জন্য বহুক্ষণ হইতে তাগিদ চলিতেছে। কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তির এই মধুর আমন্ত্রণ গ্রহণের ফুরসৎ আর হয় না।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বিস্তর। বিবাহের বরকেও বাধ্য হইয়া এতক্ষণ ছোলার ডালের বাল্‌তি ও ছ্যাঁচ্‌ড়ার থালা লইয়া ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে।

বিশেষত্বের মধ্যে যা, ঐ গেঞ্জির উপর একটা পাটভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবী চাপাইয়া আমের চাট্‌নির ঝোল মাখাইয়া বরত্ব বজায় রাখিয়াছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত্রিটা এরূপভাবে অপচয় করার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

এ হেন দিনে রাবিশ্‌ কতকগুলো লোক জুটাইয়া 'গাণ্ডে-পিণ্ডে' গেলানোর বর্বর প্রথাটা উঠাইয়া দিবার কোন আইন করা উচিত কি না, ইহাই ভাবিতে-ভাবিতে বর এই মাত্র সাবান তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছে। সহজে বাহির হইবে, ভরসা করিয়া বলা শক্ত।

ফুলশয্যার জন্য নির্দিষ্ট বিছানা, বালিশ, মালা, তোড়া....এই লইয়া বার পনের ফিরাইয়া সাজানো হইল।

পরের পয়সার এসেন্স। কে একজন দামী শিশিটা উজাড়

করিয়া বিছানায় ঢালিয়াছে। তীব্র সৌরভে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘুমন্ত কনেকে টানিয়া তুলিয়া সাজাইবার ছুতায় ঘরে যে কয়জন আছে, সকলেই একবার নিজ-নিজ সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পকুশলতা প্রকাশ করিতেছে—কতকটা চোরের মার মারিয়া যাওয়ার মত। ক্রমে তাও শেষ হইল, বরের আর দর্শন নাই।

অধৈর্য বীণা রেলিঙে মাথা ঝুলাইয়া হাঁক দিল—ছোটমামা, হল তোমার? রাত শেষ হতে চললো যে।

বর স্নান সারিয়া আসিয়াছে। পাশের একটা ঘর হইতে চাপা গলায় ভেংচাইয়া উঠিল, 'রাত শেষ হতে চললো, যত দোষ ছোট মামার। কেন, ছোলার ডাল গেলাতে আর চারটি লোক জোটাতে পারোনি? বাংলাদেশে লোক আরো তো ছিল।

—ওমা, তোমার নাওয়া হয়ে গেছে? তবে আবার কি করছো?

ছুটিয়া এ ঘরে আসিয়া বীণা চোখ কপালে তুলিয়া অবাক—াটমামা।

—আজ্ঞে।

—একি কাণ্ড তোমার? এই রাত দু'টোয় দাড়ি কামাচ্ছো।

ইতিহাসটা করুণ। সদ্য চকচকে হইবার বাসনায় দাড়ি কামানো াজটা সন্ধ্যার জন্য তুলিয়া রাখিয়া এই বিপদ। সন্ধ্যা প্রায় ভোরের াছে আসিয়া হাজির।

ইহার উল্লেখে ক্ষিপ্ত হইবারই কথা। বীণার ছোটমামা সাবান াখানো সরঞ্জামগুলো অবহেলা ভরে ঠেলিয়া রাখিয়া তোয়ালে াড়াইতে রগড়াইতে কহিল—না, তা কামাবো কেন? ছোলার ডাল াথে ফুলশয্যায় যেতে হবে। যা পালা, রাগ বাড়াস্‌নি।

বীণার পলাইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বরং আরো একটু রিয়া আসিয়া গালে হাত দিয়া কহিল—ওমা! ছোটমামা, তোমার

পেটে-পেটে এতো! এদিকে তো বিয়েই করছিলে না। ওই স
স্নো-পাউডার এখন মাখবে বসে-বসে। আজ-কালকার ছেলের
সব কি বেহায়া বাবা! এই চললাম কিন্তু সবাইকে বলে দিতে।

সবাইকে বলিয়া দিবার প্রস্তাবটা অবশ্য বেশ হৃদয়গ্রাহী নয়
ছোটমামা সবেগে চিরুণী চালাইতে-চালাইতে কহিল—থাক্, যথে
হয়েছে, আর পাকামিতে কাজ নেই। বিমল কি করেছিল রে ফুল
শয্যার দিন ? মাছের কালিয়া মেখে বুঝি…

—আহা, তাই বইকি! জামাই নিয়ে ঠাট্টা কি আবার! বিে
হলেই ছেলেগুলো গোল্লায় যায়। নাও বাপু, চলো তো এখন, ঘুমে স
মরে যাচ্ছে। কেউ দাঁড়াতে পারছে না।

—না পারলেই বাঁচা যায়। আড়ি পাততে ছাড়বি না তো ?

—মা গো, ছিঃ, আমাদের সেকেলে পেলে নাকি ?

অন্তঃপুরিকারা প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। বর আসিয়
দাঁড়াইতেই 'হল তোমার ?'…'ধন্যি ছেলে বাবা।'…'সাজতে-গুজতে
ফিঙে রাজা'…'রাত তো শেষ হলো বলে, কখন ভাব করবে আর !
ইত্যাদি নানাবিধ মন্তব্যে আসর জমকাইয়া উঠিল।

বরকে ধরিয়া চন্দন পরানোর পর, হাতের সুতা খোল
মালাবদল, কড়ি খেলা, জলখাবার খাওয়া, আচমকা কনে বেচারাকে
বরের কোলে ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি চিরাচরিত উপদ্রবকর ব্যাপা
লইয়া এমনি দৌরাত্ম শুরু হইল, যাহা দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে
এই নারীবাহিনী এতক্ষণ ঘুমে মরিতে বসিয়াছিল।

বর বাড়িরই ছেলে। বেশী বয়সের ছোট বোনেরা এবং অ
বয়সী বড় বৌদিদিরা বরাবর যথেষ্ট সমীহ করিয়াই চলে। কিন্
অদ্যকার উৎসব আনন্দে মাতিয়া ইহারা যেন সহসা লাইসেন্সপ্রাপ্
বাচাল হইয়া উঠিয়াছে।

মাসী, পিসী, খুড়শাশুড়ী, জ্যেঠশাশুড়ীর সম্মুখেই স্বচ্ছন্দে নলচে আড়াল দিয়া তামাক খাওয়া গোছের হাস্য-পরিহাস চলিতেছে।

উক্ত মাননীয়াবর্গদেরও অবশ্য মান বাঁচাইয়া চলিয়া যাইবার লক্ষণ দেখা গেল না। হাস্যমুখে এসব উপভোগ তো করিতেছেনই, কেহ-কেহ আবার তাঁর পদমর্যাদা ভুলিয়া দুই একটা টিপ্পনি দিতেও ছাড়িতেছেন না।

ইহারই ফাঁকে বর হঠাৎ প্রশ্ন করিল—পিতুকে দেখছি না যে! কোথায় গেল সে?

সত্যই বটে, এতক্ষণ গণ্ডগোলের মধ্যে পিতুর অনুপস্থিতি কাহারও নজরে পড়ে নাই।

ছোটকাকার বিবাহের যাবতীয় ব্যাপারে তাহার উৎসাহ আঠার আনা। তার তো অনুপস্থিত থাকার কথা নয়।

ছেলেমানুষীরও শেষ নাই। ঘরের দরজায় তুরপুণ চালাইয়া আড়ি পাতিবার সুবিধা করিতে প্রবল উৎসাহে সারাদিন তাহার আহার নিদ্রা নাই। আবার কোন্ ফাঁকে বিভীষণের নীতি অবলম্বন করিয়া কথাটা কাকার কর্ণগোচর করিয়া আসিয়াছে এবং সবিনয়ে শুধাইয়াছে কেবলমাত্র একলাটি সে খাটের তলায় লুকাইয়া থাকিলে কাকার আপত্তি আছে কিনা? সে তো আর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিবার মেয়ে নয়!

ছোটকাকা এদিক-ওদিক চাহিয়া চুপিচুপি কহিল—এই দেখ্ তো খাটের তলাটা।

এই গরমে খাটের তলায়!

একজন নীচু হইয়া দেখিল—পাগল, থাকতে পারে কখনো? সেদ্ধ হয়ে যাবে যে!

তবে নিশ্চয় কোথায় পড়ে ঘুমোচ্ছে।

সেইটাই স্থায্য। সকলেই সায় দিল—নিশ্চয়ই তাই, যে রাত হল, ও আবার জেগে থাকবে? চিরকেলে ঘুমকাতুরে, সন্ধ্যেবেলা রান্নার দেরি হলে অর্ধেক দিন খায় না।

একজন ফোড়ন দিল—বিয়ে হয়ে সে রোগ সারেনি? শ্বশুর ঘর করুক তো—যদি সারে!

বিবাহ হইয়াছে মাস তিনেক, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা এখনো ওঠে নাই। বাড়ির প্রথম সন্তান। ঠাকুরমার সাধের কাজটা অল্প বয়সেই সারা হইয়াছে। এই তো তাহার মাসীরাই রহিয়াছে আইবুড়ো বসিয়া…তিন-চার বছরের করিয়া বড় সব।

ইহাদের মধ্যে একজন বলিল—আমায় কিন্তু বলে রেখেছিল, ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে দিতে।

পিতুর মা তাড়া দিয়া উঠিলেন—তবেই হয়েছে। তাকে ঘুম ভাঙিয়ে দেখাতে হলে কাল হবে ফুলশয্যে। কানের গোড়ায় ক্যানেস্ত্রা পিটোলে ঘুম ভাঙে না মেয়ের, ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে পড়ে যায়। নাও ছোট্-ঠাকুরপো, আর তাকাতে হবে না। কাল তখন ভাইঝিকে ডেকে এনে খুব করে আড়ি পাতিও। তোরা আর সঙের মতন দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে বাপু। রেহাই দে দুটোকে।

সন্ত্যেবদ্ধ সেজমাসী নিষেধ সত্ত্বেও কাছাকাছি দুই-চারটা ঘর ঘুরিয়া আসিয়া কহিল—কি জানি, দেখতে তো পেলাম না। ওদিকের বড় ঘরে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে মনে হল। সুইচ খুঁজে পেলাম না, তাই দেখা হল না।

বর কহিল—পেলেও আলো জ্বলত না। বাল্‌ব খুলে নেওয়া হয়েছে। নিচে একটা কম পড়েছিল।

অগত্যা পিতুকে ডাকিয়া আনার চেষ্টা ছাড়া হইল। এতবড় বিবাহ-বাড়িতে কোথায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে কে জানে?

সম্পর্কে দিদিমা একজন গলা খাটো করিয়া একবার কহিলেন—ঘুম না আর কিছু? নাত্‌নী আমাদের বিরহে শয্যে নেয়নি তো?

নাত্‌নীর কাকা অস্ফুট বিরক্তিস্বরে কহিলেন—কি যে সব কথা! বাচ্চা একটা···

'বাচ্চা' সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও কথাটা আর অগ্রসর হইল না। একটা কারণ, সম্বন্ধটা প্রায় সকলেরই একপৈঠা নীচে। তাছাড়া সত্যই বয়সের অপেক্ষা মেয়েটা ছেলেমানুষ বেশী।

'বিরহের' ইতিহাসটা এই:

দশটা নাগাদ রাত্রি। পিতুর ঠাকুরমা, ভাঁড়ার ঘরে কি যেন কাজে ব্যস্ত। ছোট নাত্‌নী ছুটিয়া আসিয়া কহিল—ও দিদা, দিদা, জামাইবাবু বললেন যে বাড়ি যাচ্ছেন।

ঠাকুরমা হাতের কাজ ফেলিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া বাহিরে আসিলেন—ওমা, সে কি কথা! কেন, দু'দিন যে এখানেই থাকার কথা? অ বড় বৌমা, নাত্‌জামাই চলে যাচ্ছে যে! বৌমা, বলি কোথায় যে সব থাকো দিন-রাত।

বড় বৌমাকে অবশ্য খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কাজের বাড়ি। মুখফোঁড় ছোটপিসি বলিয়া বসিল—তা, তোমার নাত্‌জামাই থেকেই বা কি করবে মেজজেঠি? কিছু সুরাহা দেখছে না, চম্পট দিচ্ছে।

ঠাকুরমার ইচ্ছা, নাত্‌জামাইএর সম্যক অভ্যর্থনা হয়। বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোদেরও বলি বাছা, এতবড় বাড়িখানায় একখানা ঘর নতুন জামাইএর জন্তে গুছিয়ে রাখতে পারিস্‌নি। সবগুলো সবাই মিলে দখল করে বসে আছে। আশ্চয্যি কাণ্ড। অ ন-বৌমা! ন-বৌমার ঘরে তো···

আরো দুই-একবার জামাই আসিয়া উক্ত ঘরখানি দখল করিয়াছে।

তার কারণ ন-বৌমার ঘরখানিই বাড়ির মধ্যে ফিট্‌ফাট এবং ন-বাবু অনুপস্থিত থাকেন।

কিন্তু আজিকার কথা স্বতন্ত্র। ভদ্রলোক গত পূজার ছুটির পর এই আট মাস পরে বাড়ি আসিয়াছেন তিনদিনের কড়ারে—পিতুর বিবাহে তো আসা ঘটিয়া ওঠে নাই।

মুখরা মেয়েটা হাসি গোপন করিয়া কহিল—ন-বৌয়ের ঘর আর খালি কই মেজজেঠি? ন'দার সাংঘাতিক মাথা ধরেছে। ওডিকোলোনের পটি বেঁধে পড়ে আছেন!

—এই দেখ কাণ্ড, আজকের দিনে মাথা ধরা। দু'টি দিনের জন্যে এসেও রোগ আর রোগ! তা, সে নয় কত্তার ঘরে এসে শুক। উনি তো সেই কোন্ রাত্তিরে শোবেন—বিছানাগুলো দিক বদ্‌লে। ডাক তো ন-বৌমাকে।

দেওরঝি হতাশভাবে হাত উল্টাইয়া কহিল—কোথায় ন-বৌমা, তার তো আগেই মাথা ধরেছে। 'ক্যাফিএ্যাস্‌পিরিন' খেয়ে শুতে গেছে সেই ক—খোন।

পিতু ঠাকুরমাকে টানিয়া চুপি-চুপি কহিল—তুমি অত অসভ্য কেন দিদা, বিয়ে বাড়িতে ওসব আবার কি? যেতে চাচ্ছে যাক্‌গে না বাপু। আমিও বাঁচি। ফুলশয্যে-টয্যে দেখবো—গান-টান হবে। তা না, তোমার যত সব ইয়ে···

ঠাকুরমা নাত্‌নীর চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া বলিলেন—নেকী মেয়ের কথা শোন একবার। না বাপু, এই রাতে · সেই কলকাতা যাবে··· তাদের বাড়ির লোকেরা বলবে কি! সে হয় না। কর্তার ঘরেই বিছানা কর। খালি রয়েছে—সবাই তো আপন-আপন নিয়ে ব্যস্ত। ডাক দিকিন তোর মাকে।

পিতু গিন্নীর মত মুখখানি করিয়া কহিল—তাও কি হয় দিদা। দাদু বুড়ো মানুষ, তায় বাতের শরীর। খেটেখুটে এসে একটু ভাল করে শুতে না পেলে বাঁচবেন কি করে?

কথাটা সত্য। কর্তার কোমরে ব্যথা। পুরু গদীর উপর দুইখানি

তোষক বিছাইয়া তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হয়।

—এদের যেন সবই বিট্‌কেল। বাড়িতে এতগুলো ঘর—ঠাকুরমা বকিতে বকিতে নাত্‌জামাইকে গ্রেপ্তার করেন।

—এ কি দাদা চলে যাচ্ছো না কি ?

—নাত্‌জামাই অগত্যা একটু হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়া তো হল—

ঠাকুরমার স্বস্তি নাই—দেখ দিকি কি অন্যায়। সবাই যেন বেহুঁশ, রাগ করে যাচ্ছো না তো ভাই ?

—না-না, সে কি কথা ঠাকুমা। কাল সকালেই আসবো আবার। গিয়ে একটু লম্বা হয়ে পড়িগে। এই আর কি। যা খাওয়া হয়েছে, উঃ।

ঠাকুরমা শেষ চেষ্টার মত বললেন—আহা, তোমার বাড়ি কি এখানে ? একটি ঘণ্টা তো টেরামেই যাবে—তার চেয়ে কষ্ট করে রাতটুকু যদি এখানেই কাটিয়ে দিতে।

আগামী রাত্রি সম্বন্ধে ঠাকুরমার যথেষ্ট ভরসা আছে। কুটুম্বিনীরা হয়তো অনেকে বিদায় হইবে।

একথা জনান্তিকে একবার হইয়া গিয়াছে। পিতুকে শাসাইয়া বর বলিয়াছে—আমি তোমার ওই সব হোঁৎকা দাদাদের সঙ্গে শুতে-টুতে পারবো না তা বলেই রাখছি।

এখন কিন্তু বিনয়ের অবতার হইয়া বলে—কষ্ট আবার কি, অনায়াসেই পারতাম। কি জানেন ঠাকুমা, আমার আবার একটা রোগ আছে। মশা-টশা কি গরমের জন্যে ভাল ঘুম না হলে চট্‌ করে শরীর খারাপ হয়ে যায়।

শরীর খারাপের উপর কথা চলে না। এ হয়েছে ভালো—দু'টিই সমান। ঠাকুরমা হাল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন।

এই তো ব্যাপার। ইহাতে আর পিতুর বিরহ লাগার কথা নয়।

কিন্তু গেল কোথায় মেয়েটা ? এক-গা গহনা গায়ে সন্ধান করিতে হয় বৈকি।

দেখ মেয়ের দুঃসাহস। সারা বাড়ি ছাড়িয়া খিড়কীর দরজার বাহিরে 'ঢেঁকিঘরে' আসিয়াছে ঘুমাইতে।

ঠাকুরমা একদা শখ করিয়া ঢেঁকি পাতিয়াছিলেন। শখ মিটিয়াছে। এখন জায়গাটা প্রধানত ঘুঁটের আড্ডা। ঠাকুরমা গোছালো মেয়ে। বর্ষার দুই মাস আগে সারা বছরের ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

আহা, বেচারা পিতু ঘুমকাতুরে মানুষ। বাড়িতে গোলমাল দেখিয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বিছানা-বালিশ নাই। না থাক, ঘুম তেমন জোর আসিলে ঠেকাইয়া রাখে কার সাধ্য।

এখন বোধ করি সারারাত্রি সুনিদ্রার পর মনটি প্রসন্ন। ঢেঁকি-খানা বেঞ্চি বানাইয়া পা ঝুলাইয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছে!

বসিয়া অবশ্য একলা নাই। ঘুঁটের ঝুড়ির উপর পা মেলিয়া দিয়া পাশাপাশি বসিয়া আছে গোরাচাঁদ—পিতুর বর।

সে বেচারার কাল রাত্রে কি কম বিপদ! দশটা বাজিতেই যে কলকাতার বাসগুলো ধর্মঘট করিয়া বসিবে কে জানে বাবা!

হাজার হোক নতুন শশুরবাড়ি। চলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসাটা কেমন নয় কি?

ভাগ্যিস্ হঠাৎ পিতুর নজরে পড়িয়াছিল। তাই না চক্ষুলজ্জা বাঁচাইয়া কোনো রকমে রাতটুকু কাটিল।

তা, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। ছেলেমানুষ পিতু, এক-গা গহনা গায়ে। একলা ঘুমাইলে তো উহার জ্ঞানই থাকে না।

তবু তো গোরাচাঁদ পুরুষমানুষ। পড়িয়া নাক ডাকাইলেও আগলানো হয়।

বেড়ার দেওয়ালের খানিকটা কেমন করিয়া যেন হঠাৎ ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া বাহিরে চাহিলে বেশ বোঝা যায়,

অন্ধকার ফিকা হইয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মকাল, আলো ফুটিল বলিয়া। এই বেলা পলাইতে পারিলে গোড়ার সব দিক রক্ষা হয়। কিন্তু উহারা যে রকম নিবিষ্টচিত্তে দরকারি সব কথাবার্তা কহিতেছে, তাহাতে শেষরক্ষা হয় কি না সন্দেহ!

ধরুন নমুনা....

—আচ্ছা পিতু, তুমি ঢেঁকিতে ধান ভানতে পারো?

—ও মা, কি দুঃখে! আমি চাষাণী নাকি?

—আমার কিন্তু মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো—আর জন্মে আমি যেন চাষা ছিলাম, তুমি চাষাণী। আমি ঘেমে-টেমে বাড়ি আসতাম, তুমি আঁচল দিয়ে বাতাস করতে...

—আহা, মরি-মরি! কি কল্পনার দৌড়? রবি ঠাকুর আর কি! আমারটা বরং শোনো। তুমি যেন মহারাজা ছিলে। আমি তোমার দুয়োরাণী। মনের দুঃখে কাঠ-কুটো, পাত-টাতা কুড়োই, ধান-টান ভানি। তাই না দেখে তুমি একদিন...

—একদিন ঢেঁকিঘর থেকে কুড়িয়ে এনে সিংহাসনে বসিয়ে একেবারে পাটরাণী।

গল্পের শেষ লাইনটা গোরা নিজেই জুড়িয়া দেয় এবং ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় না সবটাই কাল্পনিক।

—তোমায় কিন্তু সবার চাইতে ভালো দেখাচ্ছিল কাল। সত্যি প্রতিমার মতন।

—আর তোমাকেও...

—আমায় আবার কি? রোজ যা পরি তাই। তুমি কতো সুন্দর করে সেজেছিলে।

—কি আর করি। কালো মনিষ্যি, সেজেগুজে যা একটু ভাল। তোমাকে এমনিই সুন্দর দেখায়...নামটাই দেখ না কেন?

—কি, গোরা, তাই না। কাদের নাম পদ্মলোচন হয় জানো তো?

—তুমি আমার চাইতে অনেক ফর্সা। জানো, বিয়ের আগে মা-বাবাতে চুপি-চুপি বলাবলি করছিলেন, আমি শুনে নিয়েছি, ও ঘর থেকে।

—কি?

—এই চাঁপাফুলের মতো রং জামাইএর। আমার পিতুকে পছন্দ করলে হয়। শেষে হিতে বিপরীত হবে না তো? বাবা বললেন···

পিতু নিঃশব্দে হাসিতে থাকে।

—কি বললেন?

—বললেন, আমিও তো কালো। তোমায় তাহলে পছন্দ হয় নি বলো?

উভয়ে হাসিতে থাকে।

একটু থামিয়া বলে—আমার কিন্তু সত্যি ভয় ধরেছিল।

—ধরেছিল? এখনই বড় ভরসা নাকি! পছন্দ হয়নিই তো।

পিতু বেশী প্রতিবাদ করে না। নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া নবলব্ধ সিংহাসনের দখলটা ষোলআনা বজায় রাখিয়া সংক্ষেপে কহিল—ইস্!

কিন্তু ইতিমধ্যে অরুণদেব হাজিরা খাতায় নাম সহি করিতে আসিয়াছেন। অগত্যা এইসব বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বন্ধ রাখিয়া উঠিতে হইল।

বেড়ার দেওয়ালে যখন একটা মানুষের বাহির হইবার পথ রহিয়াছে, তখন অনর্থক বাড়ির উঠান দিয়া ঘুরিয়া যাওয়ার আবশ্যক কি? সময় নষ্ট বৈ তো নয়। চট্ করিয়া বাস ধরিতে পারিলে বাড়ি হইতে স্নান সারিয়া আবার ঠিক সময়ে আসা যায়।

বেড়ার ফাঁকে পার করিয়া দিতে পাঞ্জাবীর পিঠে হাত লাগাইয়া

পিতু চমকিয়া ওঠে—ও মা, এ কি কাণ্ড! ভিজে থসথসে যে…কত ঘেমেছ?

—সত্যি নাকি! কই, টের পাইনি তো! যাক্ গে, শুকিয়ে যাবে বাসের হাওয়ায়।

—এই, তোমার পকেটে আমার মুক্তোর কলারটা রয়ে গেল যে! দেখেছ, ভাগ্যিস মনে পড়লো! বড়ো যে বলো ভগবান নেই? কি, আছেন কিনা দেখলে? হয়েছিল কাণ্ড! দাও।

—কি আর কাণ্ড? বল্‌তে, লাগছিল তাই রাখতে দিয়েছিলাম।

—মরে যাই বুদ্ধি! কলকাতায় গিয়ে রাখতে দিয়ে এসেছিলাম তোমার পকেটে।

অতএব ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিবার কথা নয়।

বিবাহ বাড়ির যাবতীয় গোলমাল চুকিয়া যাওয়ার নিশ্চিন্ততায় এবং গত কয়দিনের খাটুনির জেরে সকলেই ঘুমে অচেতন।

নিরুদ্বেগে পিতু পাশ কাটাইয়া উঠিয়া আসিয়া ছেলেদের ঘরে হাত দেড়েক খালি জমি খুঁজিয়া বাহির করিল।

গরমকালের ভোরের হাওয়াটা বাস্তবিকই চমৎকার।

জানালার গোড়ায় পিতু এবং দোতলা বাসের বেঞ্চিতে গোরা আবার একপালা এমন ঘুম শুরু করিল যে, দেখিলে সন্দেহ হয়, দু'জনেই বুঝি-বা বসিয়া রাত্রি কাবার করিয়াছে। তা, সেটা তো আর সত্যই সম্ভব নয়! শুধু চমৎকার হাওয়া বলিয়াই না!